# শিলাবতীর তীরে তীরে

জগন্নাথ প্রামাণিক

তারকনাথ বুক সিণ্ডিকেট
৬০ বি কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

# SILABATIR TIRE TIRE

*A Bengali Novel*

*by*

*Jagannath Pramanik*

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

প্রকাশিকা : লীলা প্রামাণিক

প্রথম প্রকাশ : শুভ রাখী পূর্ণিমা ১৩৭১

তারকনাথ বুক সিণ্ডিকেট

৬০ বি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : প্রতাপরঞ্জন রায়

রামকৃষ্ণ প্রেস

১৭ নং রামধন মিত্র লেন, কলকাতা-৪

মূল্য : পনের টাকা মাত্র

## ॥ উৎসর্গ ॥

আমার মাতৃসম বৌদি স্বর্গতা
শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়কে

## পূর্ব কথা

রাঢ় অঞ্চলের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে শিলাবতী। শিলাবতীর তীরে তীরে কত শহর কত নগর কত জনপদ গড়ে উঠেছে। বিপ্লবের পর বিপ্লব শিলাবতীর পলিমাটিকে লাল রক্তে রাঙা করে তুলেছে। কত উপজীব্য কাহিনীর, কত মায়ের, কত প্রণয়ীর বুকের ব্যথার, কত অশ্রুজলের সাক্ষী হয়ে রয়েছে ঐ শিলাবতী। তারই দু'-একটি কাহিনীকে গল্পের আকারে রূপ দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসটিতে।

## প্রথম পর্ব

সম্ভবতঃ ফার্ষ্ট ইয়ারের শেষ মাসই হবে। দৌড়তে দৌড়তে বিভাদের ফ্লাটে গিয়ে উঠলাম।

আকাশটা একটু আগে হতেই কেমন যেন গণ্ডগোল করছিল। সুখেন বলল—আর না তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে। অচিন্ত্য একটু আগে থেকেই রেডি হয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাঁধে ব্যাগগুলো ঝুলিয়ে নিলাম। রওনা হবার প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যেই টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। রাতও হয়ে গেছে। ঘড়িটা দেখলাম। পৌনে এগারটা। এসময় তিনজনে একসাথে ছুটলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। তাছাড়া পুলিশ ফাঁড়ি ক্রস করে যেতে হবে। অচিন্ত্য আমাকে বললে—তুই এই ব্যাগটা নিয়ে সোজা পাকা রাস্তা ধরে বিভাদের ফ্লাটে গিয়ে উঠবি। আমরা প্রতাপপুরের মোড় হয়ে ঘুরে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বলবি—কাল কালিপুজো, চাঁদমালা আনতে গিয়েছিলাম প্রতাপপুরে। চাঁদমালাটা একটু বার করে রাখ। জয় মা কালী বলে দৌড়তে আরম্ভ করলাম। অমাবস্যার আগের রাতের অন্ধকার। লাইট পোষ্টগুলোতে

আলো নেই বললেই চলে। কাঁধে আট-নটা বোমা। ওজন প্রায় চার পাঁচ কিলো। ভূপেনদার কথাটা মনে পড়লো। বিপ্লবীদের একমাত্র বড় অস্ত্র বুদ্ধি আর সাহস। দু'টোর একটা অভাব হলেই হার সুনিশ্চিত। বুকটা তবুও কেন যেন ঢিপ ঢিপ করছিল।

অজ পাড়াগাঁয়ে জন্ম। তিন মাইল হেঁটে স্কুলে পড়তে যেতাম। মা ভাত রান্না করে দিতেন। যেদিন মায়ের উঠতে একটু বেলা হত ভাতের হাঁড়িটা চড়ত একটু বেলাতেই। অতএব মুখে দু'টি দিয়েই কোন কোন দিন ছুটতে হতো। সমঝে ছুটা দৌড়নটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল ছোটবেলা হতেই। এজন্য মাকে অবশ্য বাবার কাছে ধমকও খেতে হত। ছুটতে ছুটতে বিভাদের ফ্লাটে গিয়ে পৌছলাম। বিভা রেডি হয়েই ছিল। আমাকে দেখেই চট করে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়েই চুপিচুপি চটপট বলল—সাবধান পুলিশ।

বিভার বাবা ইন্‌কাম ট্যাক্সের অফিসার। বর্ত্তমানে মেদিনীপুর সদরে পোষ্টিং। পাঁশকুড়া থানার বড়বাবু মাঝে মাঝে বিভার বাবার কাছে আসতেন। এটা আমার জানা ছিল। তবুও ভয়ে কাটা ছাগল হয়ে গেলাম। দরজাটা পেরিয়ে সিড়ি বারান্দায় উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ বড়বাবুর মুখোমুখি হ'লাম। বড়বাবু ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বললেন—“নমস্কার,—আসি।”

আমি বললাম—“নমস্কার।”

বড়বাবু চোখ দুটো বড় বড় করে যেভাবে আমার দিকে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তাতে মনে হল এখুনি ভস্ম হয়ে যাব।

বিভার বাবা প্রতি নমস্কার জানিয়ে বড়বাবুকে বিদেয় দেবার জন্যে গেট ছাড়িয়ে ফুটে নামলেন। এতক্ষণে আমার হুঁশ হল বড়বাবু তো আমাকে নমস্কার জানাননি? তাহলে কি হবে? পরক্ষণে ভাবলাম যাকগে ভুপেনদা আছেন। পরে জানলাম—বিভার বাবাকে বড়বাবু আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি “এই কলেজে পড়ে, আমার মেয়ের সঙ্গে; আমার ভাবী জামাই”—এই কথা বলেই অবস্থাটা

ম্যানেজ করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া বৃষ্টিও একটু জোরে পড়ছিল। বড়বাবু গাড়িতে উঠেই রওনা হয়েছিলেন।

হায়রে নিষ্ঠুর বিধাতা! প্রেম ভালবাসার মায়া, মমতা যে আমাদের কাছে তৃণের মতো তুচ্ছ তা বড়বাবু কি করে জানবেন? যৌবন যতই উচ্ছল হোক, আবেগ যতই মনকে পীড়া দিক, আমাদের কাছে মেয়ে মানেই মা—সহকর্মী বিভা আদক যদিও ক্লাসফ্রেণ্ড, সুন্দরী, স্লিম, স্মার্ট, প্রাণচঞ্চলা, তবুও সে বিপ্লবীদের একজন।

প্রথম যেদিন অশ্বিনীদা কলেজে এসে ভর্তি করেন সেদিন বলেছিলেন—দূরে রেখে গেলাম, পার্টি-টার্টি করিসনি। মন দিয়ে পড়বি। এখন আন্দোলনের ঢেউ চলছে—দেখিস খুব সাবধান। স্কুলে অবশ্য পাণ্ডামি করতাম। কিন্তু সে কতটুকু। ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় হিসেবে যতটুকু করা যায় শিক্ষকদের কাছে ভালো ছেলে থেকে, ততটুকুই মাত্র। প্রথম প্রথম কলেজে কেমন যেন লাগত। দশটায় ক্লাসে যেতাম ফিরতাম চারটেয়। ক্যান্টিনে আড্ডা দেওয়া আমার ভাল লাগত না। সামনে এলিমিনেশান টেষ্ট। অনার্স রাখতে হবে। এটাই সারাক্ষণ চিন্তা হতো।

দেখতে দেখতে পাঁচ মাস কেটে গেল। কলেজের সোস্যাল ফাংশান এসে গেল। নাটক হবে। নাটক বিপ্লবী ক্ষুদিরাম। স্কুলে নাটক করতাম। প্রাইজও পেতাম। তাই বলে কলেজে নাটক করব স্বপ্নেও ভাবিনি। মেসের সেই মাসের ম্যানেজার ছিলেন শশাঙ্কদা। আমি ছিলাম হিসাবরক্ষক ও ক্যাসিয়ার। শশাঙ্কদা সবসময় বাইরে থাকতেন। কখন আসেন, কখন খান এবং কখন আবার বাইরে যান তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই তিনি নামে মাত্র ম্যানেজার সেজে সমস্ত কিছু দায়দফা আমার ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন। এই সুযোগে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্টতা বাড়তে লাগলো।

শশাঙ্কদা প্রফেসার লাহিড়ীর সাথে বোধহয় কথা বলে রেখেছিলেন। সেদিন কলেজে যেতেই আমাকে বললেন—"তোর কি আজ তিনটেয় ক্লাস আছে।"

আমি বললাম—না আজ ছুটো চল্লিসে ক্লাস অফ্ হবে।

তিনটের সময় অডিটোরিয়াম হলে একবার যাস।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

শশাঙ্কদা বললেন

—বিপ্লবী ক্ষুদিরাম নাটকের ট্রায়াল দিতে হবে।

—আমার দ্বারাই ওসব হবে কি!

—দেখতে দোষ কি।

শশাঙ্কদা যা গম্ভীর থাকেন তার মুখের উপর তর্ক করব সে সাহস আমার ছিল না। তাই তিনটের সময় অডিটোরিয়াম হলে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঠিক তিনটে দশের সময় শশাঙ্কদা, প্রফেসর লাহিড়ী এসে পৌঁছলেন।

ট্রায়াল আরম্ভ হল। সাতজনের পর আমার ট্রায়াল পড়ল।

ট্রায়াল ছিল কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ির ওপর বোমা ছোঁড়া। বোমার নাম শুনেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। তার আবার ট্রায়াল কি দেব?

তবুও চান্স পেয়ে গেলাম। রীতিমত নাটক জমে উঠল। মঞ্চস্থ হল। ভালভাবেই বেরিয়ে গেলাম ফার্স্ট হয়ে। নাটক সূত্রেই পরিচয় হল বিভাদের সাথে। প্রফেসর লাহিড়ী হঠাৎ একদিন ডেকে পাঠালেন বাসায়। শশাঙ্কদার সাথে গেলাম। নাম লেখালাম বিপ্লবীদের খাতায়। বিপ্লবীদের সকলের কাছে ক্রমে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে লাগলাম। তারপর প্রথমে চলল কয়েকদিন গেরিলা ট্রেনিং। পরে আমার উপর ভার পড়ল বোমা বানাবার আর বোমা ছুঁড়বার। তন্ত্রে-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গেলাম।

প্রেম বা ভালবাসা আমাদের অন্যায়। কারণ তাতে মনে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। প্রেম ভাগাভাগি হয়ে যায়। যাদের মনে স্বদেশ প্রেমের উদয় হয় তাদের কামান্ধ প্রেমকে প্রশয় দেওয়া চলে না। নারীর শরীর

যৌন প্রক্রিয়ার আধার। অতএব মেয়েকে ভালবাসলে দৈহিক দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। এই ছিল পার্টির নারী সম্বন্ধে সোলেনামা।

অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরিব্যাপ্ত হয়। বীজ বৃষ্টি পেলেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। বিভার সাথে প্রথম যেদিন কথা বললাম—সেদিন প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন্।

সেদিন সত্যিই মনটা ক্ষণেকের জন্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। বিভা কলেজের নাম করা সুন্দরী মেয়ে। আমাদের ক্লাসেই পড়ে। ইতিপূর্বে ওকে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু ভালভাবে তাকায়নি। এই প্রথম ওর দিকে তাকালাম। পরনে উলিশাড়ী, ম্যাচকরা ব্লাউজ; কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ লাগালো, চোখে সুরমা, সাম্পু করা চুল। গড়ন অনুসারে প্রতেকটা জিনিষ মানানসই। রামায়ণে কথিত আছে রাক্ষস রাজ রাবণ রম্ভার রূপে মোহিত হয়ে জোর করে বলাৎকার করেছিলেন। কিন্তু রাবণ ছিল রম্ভার শ্বশুর! দেবরাজ ইন্দ্র গুরুগৃহে গুরুপত্নী হরণ করে সহস্র যোনীর অধিকারী হন। আমি তো মানুষ মাত্র। আর ওর সাথে আমার সম্পর্কই বা কি? পরক্ষণেই প্রফেসর লাহিড়ীর কথা মনে পড়ল—নারী নরকের দ্বার। প্রাইজ নিয়ে হাঁটছিলাম রেল লাইনের উপর দিয়ে। মেসে ফিরছি। হঠাৎ পিছন দিক থেকে কে যেন ডাকল।

'এই যে শুনুন।'

'আমাকে কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ আপনাকে।'

'বলুন।'

কাল সন্ধেয় আমাদের বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ। এই কথা বলেই বিভা ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে হাতে দিল। তারপর বাড়ির পথনির্দেশ দিয়ে চটপট এগিয়ে গেল। আমাকে কোন কথা বলারই সুযোগ দিল না।

কালবৈশাখীর ঝড় উঠলে গাছপালাগুলোর বুক যেমন দুরু দুরু

করে, সকাল থেকেই আমারও প্রাণটা সেইরকম করছিল। প্রথম যেয়ে কি করব। বিভার বাবাকে কি বলে সম্বোধন করব। প্রণাম করব না নমস্কার করব। কেনই বা নিমন্ত্রণ করল? কিইবা গূঢ় রহস্য? বিবিধ চিন্তায় মাথাটা শুধুই ঘুরপাক খাচ্ছিল। ক্রমে দুপুর পেরিয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। ট্রাউজার-গলালাম এবং শার্টটা পরে নিলাম। পরক্ষণে মনে হল নিজেকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। ট্রাউজার খুলে প্যান্টটা পরলাম। মাথাটায় চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে ঘড়িটা ও চটিটা পরে মেস থেকে বেরিয়ে এলাম। সোজা রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগলাম। বিভাদের বাড়ি আগে থেকেই জানতাম। একদিন শশাঙ্কদার সাথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। শশাঙ্কদা বলেছিলেন—"চিনে রাখ। এইটি তোর সাথে বিভা বলে যে মেয়েটি পড়ে তাদের বাড়ি।" স্টেশনটা ছাড়িয়ে সোজা উত্তরদিকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই সিরীশতলায় বিভাদের বাড়ি। মিনিট কুড়ি হাঁটতেই পৌঁছে গেলাম। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে বিভা বেরিয়ে এল।

—'আসুন!'

বিনা দ্বিধায় বিভার পিছনে পিছনে চললাম। সিড়ি বারান্দা পেরিয়ে সোজা দোতলার ঘরে গিয়ে যা দেখলাম তাতে ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। প্রশস্ত টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার। মাথার ওপরে ফ্যান। একটা চেয়ারে দরজার দিকে দক্ষিণ মুখ করে বসে আছেন শশাঙ্কদা আর একটাতে বসে আছেন পূব মুখ করে চশমা পরা এক মাঝবয়সী ফিট ফর্সা ভদ্রলোক। আদলে ও চেহারায় বুঝতে পারলাম বিভার বাবা।

ঘরে ঢুকতেই শশাঙ্কদা বললেন—বোস। পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি হচ্ছেন বিভার বাবা ভূপেনদা—পার্টির ব্লক শাখার সেক্রেটারী। সমস্ত উত্তেজনা নিমেষে উবে গেল। কিছুটা অনুমান করতে পারলাম কেন আমাকে ডাকা হয়েছে। কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। ঘরের দেওয়াল-টার দিকে তাকাতে যা দেখলাম তা সত্যই অপূর্ব। মাও সে তুঙ্-এর

একটা জীবন্ত তৈল চিত্র। তাছাড়া লেনিন, মার্কস এর ছবি পাশা-পাশি। ছবিগুলো যে অনেক যত্ন করে রাখা হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। ভূপেনদার নাম আগে শুনেছিলাম। কিন্তু দেখবার অনুমতি পাইনি। এই প্রথম দেখলাম। সত্যই ভূপেনদা সেক্রেটারীরই যোগ্য। নিষিদ্ধ পার্টির সেক্রেটারী ভূপেনদা।

আমাদের পার্টির কোন ক্যাডারকে টপ সেক্রেট জানবার আগে বহু ভাবে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। আমার বোধহয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই ভূপেনদার সাথে পরিচয় এবং তার হাতে শেষ শিক্ষা।

কিছুক্ষণ বাদে ভূপেনদা কথা বললেন—তুমিই আমাদের পার্টির বোমা বানানোর ও এ্যাকসনে বোমা ছোড়ার যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছ। তাই তোমাকে আজ আমি কয়েকটি কথা বলব।

আমি—বলুন।

ভূপেনদা—তুমি আমাদের পার্টিতে ঢুকলে কেন?

আমি—দেশকে ভালবাসি তাই।

ভূপেনদা—তোমার বাবা-মা আছেন?

আমি—আছেন।

ভূপেনদা—তারা যদি আপত্তি করেন?

আমি—মানব না।

ভূপেনদা—কেন?

আমি—কারণ ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর স্বার্থের দাম বেশী তাই।

ভূপেনদা—বাঃ—সুন্দর! তুমি নিশ্চয় জান আমাদের পার্টিতে বিশ্বাসঘাতকদের কি শাস্তি দেওয়া হয়?

আমি—হ্যাঁ-জানি মৃত্যুদণ্ড।

ভূপেনদা—তোমার ভয় করে না?

আমি—আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কোন মায়া নেই।

ভূপেনদা—তুমি বাড়ীর সবচেয়ে বেশী ভালবাস কাকে?

আমি—আমার বাবাকে।

ভূপেনদা--আমি যদি বলি পারবে তোমার বাবার মাথা আনতে?

আমি—নিশ্চয়।

ভূপেনদা—সাবাস, মাই কমরেড।

ভূপেনদা বললেন—কানাই তুমি ওকে বোমা বানানোর সব কিছু মাল মশলা দিয়ে দিও। সুখেন আর অচিন্ত্যকে বলল—তোমাদের আমি অন্য ডিউটি ঠিক করেছি। এ কাজ আর তোমাদের করতে হবে না। তবে হ্যাঁ সব সময় তোমরা এর দিকে লক্ষ্য রাখবে।

তারপর শশাঙ্কদাকে বললেন—শুনেছ নগেন্দ্র সেতুয়া বড়বাবুর সাথে হাত মিলিয়ে এজেন্ট হয়েছে। আমাদের গোপন খবর সন্ধান করছে।

শশাঙ্কদা উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, গতকাল লাহিড়ীবাবুর মুখ থেকে শুনলাম। ভূপেনদা বললেন—ঠিক আছে। আগামী পরশু ভোরে একটা এ্যাকসান নাও। সেতুয়া যখন কাঁসাই-এ স্নান করতে যাবে—রেলক্রসিং এর ব্রীজের নীচে এ্যাকসান হবে। ছোট এ্যাকসান। বেশী ছেলের দরকার নেই। তুমি নীরেনকে ভোজালী নিয়ে ঠিক চারটে দশ মিনিটের সময় পুলের নীচে পূবধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে অচিন্ত্যকে বলবে লাসটাকে বোম্বে রোডের মাঝে ফেলে দিতে। ভোরে খুব বেশী ট্রাক যায়। ট্রাকে পেশাই হয়ে যাবে। সঙ্গে বোমা রাখবে। পুলিশ যদি টের পায়—এ্যাকসান চলবে।

শশাঙ্কদা জিজ্ঞেস করলেন—আজই তাহলে লাহিড়ীবাবুর কাছে যাব? ক'টায় উনি ওঠেন সেটা আগে জানা দরকার।

ভূপেনদা বললেন—তার কোন দরকার নেই। উনি পৌনে চারটে নাগাদ ওঠেন। তেল মাখতে পাঁচ মিনিট লাগে, তিনটে পঞ্চাশ-এ বাড়ী থেকে বের হন। চারটে দশের সময় রেল পুলের কাছে গিয়ে পৌঁছান।

শশাঙ্কদা—আজ তাহলে উঠি?

ভূপেনদা—না বোস। বিভা সিক্রেটে সাইন ব্যাজ নিয়ে এস।

বিভা ব্যাজ নিয়ে এল। ভূপেনদা আমার হাতে দিয়ে বললেন—এইটি সব সময় কাছে রেখো না। প্রয়োজন মতো ব্যবহার করবে।

ব্যাজ নিয়ে আমি আর শশাঙ্কদা বেরিয়ে এলাম। পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। কারও মুখে কোন কথা নেই। নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় মেসে পৌঁছলাম। শশাঙ্কদা বললেন—খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।

ঠিক ঠিক এ্যাকসান হয়ে গেল। নগেন্দ্র সেতুয়া মার্ডার হল। খবরের কাগজে সংবাদ বেরল—ডেবরার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী খুন। বিপ্লবী-দের গোপন বোমা তৈরীর ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে আজও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। কলকাতার প্রখ্যাত আই-জি সুনীল মিত্রকে স্পেশাল তদন্তের জন্য পাঁশকুড়ায় পাঠানো হয়েছে।

পার্টির থেকে অর্ডার এল আত্মগোপন করার জন্যে—পাঁশকুড়াতে এখন কয়েকদিন আমার থাকা চলবে না। আমাকে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছিল বিভার উপর। সকালে বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে দেখলাম বিভা ব্যাগ নিয়ে রেডি। জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যেতে হবে? বিভা সংক্ষেপে উত্তর দিল—কোটাপামা। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কোথায়-কতদূর? বিভা বলল,—হুগলী জেলায়, মাইল তিরিশেক হবে।

বাস এসে গেল। পাশাপাশি দু'টো সিট নিয়ে আমি আর বিভা বসে পড়লাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এত দূরে না গেলে কি হোত না?

বিভা বলল—বাবার আদেশ।

আর কিছু বললাম না। এ্যাকসানে পুলিশের সাথে সামান্য ফাইট হয়েছিল। হাতটা একটু কেটে গিয়েছিল। ব্যাণ্ডেজটা একবার দেখে নিয়ে চেয়ার সিটে হেলান দিলাম। চোখে ঘুম নেমে এল। স্টপেজে বাস পৌঁছতে বিভা আমাকে ডাকল। দু'জনে নেমে এলাম। আমি আর বিভা হাঁটতে শুরু করলাম। ব্যাগে চার পাঁচটা

বোমা ছিল। ঐ গুলোই আত্মরক্ষার সম্বল। বিভাকে বললাম—কতটা হাঁটতে হবে?

বিভা বলল—চার মাইল। আমি বললাম—হাঁটতে পারবে? একটা রিক্সা নিলে হত না?

বিভা বলল—এ রাস্তায় গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যান চলে না। ছোটবেলায় মায়ের সাথে বহুবার গিয়েছি কষ্ট হবে না।

যাঁর বাড়ীতে যাচ্ছি তিনি তোমার কে হন?

—মেসো।

—কি নাম ভদ্রলোকের?

—ধীরেন মাল, মানে মহান্তি।

—তিনি কি আমাদের খবর জানেন।

—না।

—তবে?

—বাবা টেলিগ্রাম করেছেন—তুমি, তার ভাবী জামাই। দিন কয়েক বেড়াতে যাচ্ছো।

কথাটা শুনে কেমন যেন লজ্জা হল। বিভাও যে লজ্জা পেয়েছে তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারলাম আমাকে ভাবী জামায়ের অভিনয় করে থাকতে হবে।

বারটা-একটার সময় গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। আমাদের দূর থেকে আসতে দেখে একটি ষোল সতের বছরের মেয়ে দৌড়ে এসে ব্যাগটা নিতে চাইল। আমি বললাম—ঠিক আছে চল। বরং তোমার দিদির ব্যাগটা নাও। বিভা আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ব্যাগটা দিয়ে দিল। পরিচয়ে জানলাম, বিভার মাসতুতো বোন শ্যামলী।

ঠাট্টা, তামাসা, হাসি আর ভুরিভোজে কোনদিকে যে সাতটা দিন কেটে গেল তা বুঝতে পারলাম না। অভিনয় ভালই করতে পারতাম। কেউ আদৌ বুঝতেই পারল না আমি প্রকৃত জামাই নই। প্রতিদিন

কেউ না কেউ হবু জামাই দেখতে আসে। আমি বেশ ইনিয়ে বিনিয়ে আলাপ করি।

রাত্রি সাড়ে দশটা। ভাতটাত খেয়ে শুতে যাচ্ছি। বিভা বিছানা করতে এল, সঙ্গে শ্যামলী। আমি বললাম—শ্যামলী একটু বাইরে যাও, তোমার দিদির সাথে কয়েকটা কথা আছে। শ্যামলী মুচকি হেসে একটা টিটকারি দিয়ে চলে গেল।

আমি বিভাকে জিজ্ঞেস করলাম—আর কতদিন থাকতে হবে?

বিভা বলল—যতদিন না বাবার ফেরার পুনরাদেশ পাই। আমি বললাম—পরিচয়টা কি অন্য দিলে হত না, এভাবে অভিনয় করতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

বিভা হেসে বলল—বেশ তো আছো বাবা জামাই সেজে, জামাই-খাতির খাচ্ছ—তার আবার কষ্ট কি।

সিগারেট ধরিয়ে বললাম—যা কখনও আদৌ সত্য নয়, যা কখনও ঘটবে না তা নিয়ে খেলা করলে কি যে কষ্ট হয়, তা তুমি কি বুঝবে!

বিভা আমার হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল—সবই বুঝি আমিও হাজার হলেও নারী।

আমার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ খেলে গেল। ঝিঁকুনি দিয়ে হাতটা টেনে নিলাম। লাহিড়ীবাবুর একটা কথা মনে পড়ল, 'বিপ্লবীদের মনে বা শরীরে কোন দুর্বলতা থাকা চলে না।' মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল, বললাম—যাও শুতে যাও রাত্রি হয়েছে। ওধারের কিছু খবর পেয়েছ?

বিভা বেশ লজ্জা পেয়েছিল, মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—না।

আরও দু'দিন কেটে গেল, সকলের সাথে বেশ আলাপ জমে উঠেছে। বিভার মাসী শ্যামলী, অশোকদা সকলেই যেন কত আপনার। শ্যামলী স্কুলে যায়। দশম শ্রেণীতে পড়ে। স্কুল থেকে ফিরেই চান করে সোজা চলে আসে আমার কাছে, অঙ্ক আর ইংরাজী পড়ার জন্য। শ্যামলীর দাদা প্রত্যেক দিন আরামবাগে ছানা বিক্রি করতে যান, ওদের ছানার ব্যবসা আছে। দাদা চলে গেলেই আমাকে নিয়ে শ্যামলী

নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে বের হয়, কোন কোন দিন বিভাও সঙ্গে যায়। কত ঠাট্টা তামাসা করে আমাদের নিয়ে।

সেদিনও বিভা ছিল আমাদের সাথে। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। নদীর পাড়ে ছোট একটা জাম গাছ। আমি আর বিভা বসেছিলাম জাম গাছটার তলায়। শ্যামলী আমাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মাঠ ভর্তি সবুজ ধান। নদী ভর্তি নীল জল। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি। নদীতে একটা ফুল ভেসে আসছিল। শ্যামলী বলল—আপনাকে চিনতে হবে এটা কি ফুল ভেসে আসছে।

আমি বললাম—যদি না বলতে পারি!

বিভা বলল—তাহলে তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে না।

আমি হেসে বললাম—তাহলে কার সাথে হবে?

বিভা বলল—শ্যামলীর সাথে?

শ্যামলী 'যা'—বলে জামডাল দিয়ে বিভাকে মারতে লাগল ঠাট্টা করে।

সন্ধে হয়ে এল। এক ঝাঁক সাদা বক আকাশের কোল দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সূর্যাস্তের লাল আভায় সেগুলো যেন লালে লাল হয়ে উঠেছিল।

বাড়ী ফিরে হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিলাম। প্রতি দিনের মতো শ্যামলী পড়তে এলো। বিভা মাসীমার সাথে গেল রান্না ঘরে। কিন্তু একি আশ্চর্য? প্রাণচঞ্চলা শ্যামলী কেন আজ এত গম্ভীর। বয়সের তুলনায় শ্যামলীর স্বাস্থ্যটা কিছু বেশী হবে। যৌবনের আলো ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে বুকে। টানা টানা চোখ—নাকে গোল ডিজাইনের নোলক। তাতে চারটে ঝুরি। কানে গোল রিং। সাদা ফর্সা রঙের উপর সুন্দর দেখায় শ্যামলীকে। শ্যামলী বাড়ীতে ফ্রক পরত। ফ্রক পরলে ওকে আমার বাচ্চা মেয়ের মতো মনে হতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে, এত গম্ভীর কেন?

শ্যামলী আস্তে জবাব দিল—এমনি, কিছু না—মাথা ধরেছে।

আমি বললাম—তবে আজ আর পড়তে হবে না শুয়ে পড়গে।

শ্যামলী ক্রুর দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর নিজেই বই-এর পাতায় ঘাড় গুঁজে পড়তে আরম্ভ করল। এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর আমি বললাম—অঙ্ক বের কর। শ্যামলী বলল—দুপুরে হয়ে গেছে।

আমি বললাম—তবে ট্রানশ্লেশন্ কর।

শ্যামলী বই খুলে প্যাসেজ ধরে দিল।

বইয়ের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বনপর্বের অংশ। কাষ্ঠাহরণে গিয়ে নবকুমার বনবাসে বিসর্জিত হলে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে প্রথম যে সম্বোধন করে ডেকেছিল সেই অংশ—"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ।"

শ্যামলীর মুখের দিকে তাকালাম। মুখে সুন্দর প্রতিহিংসার চিহ্ন। সেই যেন যুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

সমস্ত পরিস্থিতিটা কেমন যেন বিশ্রী লাগল আমার। বললাম—পড়, আমি বাইরে একটা সিগারেট খেয়ে আসছি।

এই ঘটনার পর সমস্ত পরিবেশটা আমাকে যেন কেমন লাগতে লাগল। শ্যামলী কচ্চিৎ পড়তে বসে। ভালভাবে কথা বলে না, হাসে না। অথচ কেউ বুঝতে পারে না—দু'জনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। নিজেকে আমার অনেক ছোট মনে হল। সেইরাত্রে বিভার কথা মনে পড়লেও কষ্ট বোধ করি। কখনও মনে হয় কোথাও পালিয়ে যাই কাউকে না জানিয়ে। আবার মনে হয় আমি কী কাপুরুষ? সামান্য দু'টো নারীর কাছে নিজেকে হার স্বীকার করে নেব।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছি—হঠাৎ বিভা একটা চিঠি নিয়ে এসে হাতে দিল। শ্যামলী কি মনে করে কাছে আসছিল। হঠাৎ আবার চলে গেল। চিঠিটা খুলে পড়লাম। সন্দেহ বশতঃ প্রফেসর লাহিড়ী এ্যারেস্টেড্। আমাকে পঁচিশ তারিখে রাত্রি আটটায় উদয়পুর বাস-

স্টপেজে দাঁড়াতে হবে। অচিন্ত্য আসবে। পার্টির নির্দেশ সেখানেই পাওয়া যাবে। পুলিশ আমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। হন্যে হয়ে খুঁজছে।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে নিয়ে আমার শোবার ঘরে চলে গেলাম। চিঠিটা দেশালাই জ্বেলে পুড়িয়ে দিলাম।

চব্বিশ তারিখে চিঠি পেয়েছিলাম। আজ পঁচিশ তারিখ। বিভা সব ঠিকঠাক করে দিল। সন্ধে হতেই বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে অশোকদা। ইতিপূর্বে আমি মোটেই জানতে পারিনি—এ বাড়ীর সকলেই জেনে গেছে আমরা বিপ্লবী। অশোকদার বাবা বেশ বুদ্ধিমান। বয়স প্রায় চল্লিশের উপর। গ্রামের একজন হোমরা-চোমরা লোক। খুব কম কথা বলেন। চলনে-বলনে বুঝা যায়—খুব চতুর ও বেশ লেখা-পড়া শিখেছেন। বোধ হয় আমাদের আন্দোলনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাই অশোকদাকে বিনা দ্বিধায় আমার সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা ঠিক সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় উদয়পুর বাসস্টপেজে গিয়ে পৌঁছলাম। আটটায় গাড়ী এসে পৌঁছল। অচিন্ত্য এমন বেশে ছিল কার সাধ্য তাকে চেনে। পার্টির সিক্রেট সাইন ব্যাজ বার করলাম। সেও বার করল। নিকটে যেতে চিনতে পারলাম।

অচিন্ত্য বলল—তোকে এখনও এখানে দিন পনের থাকতে হবে। গ্রামে কেউ পিছু লেগেছে নাকি দেখবি। আর হ্যাঁ—তোর বাবার খুব অসুখ। আমার সঙ্গে চল। রাতে গিয়ে দেখা করেই ফিরতে হবে।

বাবার অসুখ শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বাড়ী থেকে আজ প্রায় তিন মাস এসেছি। একটা চিঠিরও উত্তর দিইনি! মাঝে অশ্বিনীদা একবার এসেছিলেন। তার হাতেই সংবাদ পেয়েছিলাম ইদানীং বাবার শরীরটা খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। মায়ের জন্যও মনটা খারাপ হয়ে গেল। অশোকদাকে বিদায় দিয়ে বাসে চড়লাম। লাষ্ট ট্রেন দশটায়। ট্রেন থেকে নেমে একমাইল হাঁটতে হয়। গ্রামে যেতে রিক্সাও পাওয়া যায় রাত্রিতে।

বাসে যেতে যেতে অচিন্ত্যর সাথে কোন কথা হল না। বাসে কথা বলা নিষেধ। কখন কোথায় স্পাই থাকে বলা যায় না। বাবার কি হয়েছে, কেমন আছেন জানবার জন্যে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বার বার ছোটবেলাকার কথা মনে পড়তে লাগল। বাবার স্নেহ ও ভালবাসায় দিন দিন কিভাবে পাথরের ন্যায় শক্ত হয়েছিলাম তা অনুভব করলাম। আমার গতিবিধিতে বাবা কোনদিন হস্তক্ষেপ করেননি। যখন যা খেতে চাইতাম—যা জিনিসের জন্য বায়না ধরতাম তাই তিনি দিতেন। আমার স্বাধীনতা ছিল বাবার কাছে অবাধ, অপার। খুব মনে পড়ে, আমার বয়স তখন আট কি নয়। একবার নিজে সরস্বতী প্রতিমা গড়েছিলাম পুজো করার জন্য। বাড়িতে অশৌচ। বাবা বললেন—এ-বছর পুজো হবে না। আগামী বছর খুব ঘটা করে পুজো হবে। ইতিপূর্বে আমাদের বাড়ীতে কোনদিন প্রতিমা পুজো হয় নি। আমি বললাম, 'না—এবছরই বড় ভট্টাচার্য্য দিয়ে পুজো করতে হবে।' বাবা আর বাধা দিলেন না। খুব ঘটা করেই পুজো হয়ে গেল। তিন দিন ধরে কত লোকজন খেল গ্রামের। পুজোতে প্রায় সাত-আটশ টাকা খরচ হল। পরে বাবা কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—'আমি মরে গেলেও যেন বাড়ী থেকে প্রতিমা পুজো কখনও না উঠে যায়।' সেই থেকে প্রতি বছর বাড়িতে সরস্বতী পুজো হয় আমাদের।

পথে যেতে যেতে বারবার মনে পড়ছিল সেই সব বাল্যকালের স্মৃতি। বাবা-মার অপত্য স্নেহ আমাকে একটা উপলখণ্ডের উপর শিলা-লিপির দৃঢ় অবয়ব করে তুলেছিল। সেখানে যতই আঘাত করা যাক্ কোনরূপে নমিত বা ধ্বংস হবার চিহ্ন মাত্র ছিল না। যত বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন জীবনে, সবই লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা আমার ছিল। বাবার দৃঢ় চরিত্র আমার ওপর স্বভাবতঃই প্রভাব বিস্তার করার জন্যই। সেই বাবার দারুণ অসুখ শুনে মনটা খুবই চঞ্চল হয়ে

উঠেছিল। ট্রেন থেকে নেমে গ্রামের রিক্সাওয়ালা অভয়কে জিজ্ঞেস করলাম—অভয় বাবা কেমন আছে জানিস্?

অভয় বলল—চলুন না বাবু বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবেন।

অভয়ের এ কথায় মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বললাম—অভয় বল, বাবা কেমন আছেন?

অভয় বলল—বলতে পারব না বাবু, দিন দুই বাড়ি যাইনি।

কেন যাসনি?

—প্যাসেঞ্জারের ভিড় ছিল।

রাত্রি প্রায় একটার সময় গ্রামের প্রান্তে গিয়ে ঢুকলাম। দূর থেকে একটা আগুনের শিখা দেখে—বুকটা একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। আমাদের গ্রামে ঢুকবার পূর্বপ্রান্তে শ্মশান। আমাকে দেখামাত্রই মাণিক কাকা হাউমাউ করে কেঁদে বললেন—বাবু সব শেষ হয়ে গেল।

জীবনে কোন দিন কাঁদিনি। কোন আত্মীয় বিয়োগের ব্যথাও উপলব্ধি করিনি। আজ বাবার মৃত্যুতে মনে হতে লাগল—আমি কোথায় যেন একটা বিরাট দোষ করে ফেলেছি। আমার মনে হল—এই তো জীবনের স্থায়িত্ব। আমার বলতে কোনটাই সত্য নয়। তবে তার ওপর কেন এত মায়া! শ্মশানে গিয়ে সেজকাকা, ছোটকাকাকে দেখে আরও ভেঙে পড়লাম। সকলের কাছে আমাকে মনে হতে লাগল স্বতন্ত্র। কাঁদবার চেষ্টা করলাম। চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল এল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেল। এক কলসী জল এনে শ্মশানের মাটির দীর্ঘকায় মূর্ত্তির বুকের উপর কলসীটা বসিয়ে দিয়ে—ছুটে গিয়ে ছোটকাকার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। ছোটকাকা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—কাঁদিস না—কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। পরিবর্তনশীল জগতের এইতো নিয়ম। সকলকেই একদিন চলে যেতে হয়। ঐ যে শিলাবতীকে দেখছিস না—ছেলেবেলায় দেখেছিলাম ছোট্ট একটা কাটা খাল, যৌবনে দেখলাম—দীর্ঘকায় নদী। হয়ত বুড়ো বয়সে দেখব মজে যাওয়া পরিত্যক্ত একটা

বালুর চর। শ্মশানের কাজ শেষ হলে আমার গলায় কাছা পরিয়ে দেওয়া হল। বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

বাবার হাতে পোঁতা একটা শিমূল গাছ ছিল উঠোনে। শিমূলফুল ঝরে রক্তের মতো একটা আবরণ সৃষ্টি করেছিল তলাটায়। আমার মনে হল বাবা বোধহয় রক্ত দিয়ে মাটিতে একটা স্মৃতির আঁচড় টেনে দিয়েছেন। আর আমি সেই রক্ত নদীর দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছি।

বাড়ীতে ফিরে মাকে দেখলাম। অচিন্ত্য মায়ের পাশেই বসে ছিল। মা আমাকে দেখে ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন। আমার দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারার মত জল গড়িয়ে এল। অচিন্ত্য আমার হাত ধরে মায়ের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলল—কাঁদিস না, সময় হলে সকলকে চলে যেতে হয়। যদিও আমি এ-কথাটা ভালভাবেই বুঝতাম তবুও বাবার মৃত্যুটাকে আমি তখন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে ভাবতে পারছিলাম না। বাবা নেই, একথাটা চিন্তা করতেই কেমন যেন লাগছিল। মায়ের ফোলা ফোলা চোখ দু'টো দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল অতীত দিনের স্মৃতিগুলো। মা নামকরা বংশের মেয়ে। মায়ের বাবা, আমার দাদু, সৌমেন পোদ্দার এককালে বড় ধরণের বিপ্লবী ছিলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে বহুবার জেল খেটে আন্দামানে দ্বীপান্তরে বেশ .কিছুদিন ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সেখান থেকে ফিরে এসে একবছর পর মারা যান। সেই বংশের মেয়ে মা। বিপদে মায়ের মত ধৈর্য্যশীলা মেয়ে আমি জীবনে খুবই কম দেখেছি। যখন আমার ছোট ভাই সৌরেন সাত বছর বয়সে কলেরায় মারা যায় তখন মা যে কি ভীষণ ধৈর্য্যশীলা তার পরিচয় পেয়েছিলাম। সেই মায়ের অবস্থা দেখে চমকে উঠলাম। আমাদের সংসার যে গার্জেন হীন হয়ে পড়ল সেটা আমি ভালভাবেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলাম। মা-ও বোধ হয় তাই ভাবছিলেন। আমার চিন্তা শুধু মাকে নিয়েই। কারণ আমি জানি আমাকে চলে যেতেই হবে। মাকে কে দেখবে। কাকারা সকলেই পৃথগন্ন। তাছাড়া ছোটকাকা অন্য ধরণের মানুষ। বারোমাসের

ছ-মাস তিনি বাইরেই থাকেন। ছোটকাকা যাত্রামোদী। তিনি যাত্রা-দল নিয়ে আসাম বিহার প্রভৃতি সফরে বেরিয়ে যান। বাবাই পারত-পক্ষে ছোটকাকার সংসার দেখাশুনা করতেন। আজ বাবা নেই। ছোটকাকার সংসারই দেখে কে! আর ছোটকাকা দেখবেন আমাদের সংসার! নানা চিন্তায় আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

বিধির নিয়মে সবই চলমান। পৃথিবীতে কারও জন্য কিছু আটকে যায় না। বাবার জন্যও নিশ্চয় কিছুই আটকে যাবে না হয়ত। তবুও যেন সবই অচল মনে হচ্ছিল।

ভোর হয়ে এল। পূর্বদিগন্তে লালের আভা দেখা দিল। আমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। অতএব সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে আমাকে চলে যেতেই হবে! অচিন্ত্য সব কিছু মাকে বলেছিল। তাই আমাকে আর কিছু বলতে হল না।

বেলা ন'টার সময় নির্বিঘ্নে ফিরে এলাম কোটাপামায়। বাবার মৃত্যুর সংবাদে বিভা খুব দুঃখ পেয়েছে বুঝতে পারলাম। শ্যামলীর ভাবান্তরটা আমাকে যেন আরও ভাবিয়ে তুলল। শ্যামলী স্কুল প্রায় যেতেই ভুলে গেল। আমার হবিষ্যি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কাজ সে নিজেই সযত্নে করে দেয়।

শ্যামলী নিজেও নিরামিষ খায়, মাথায় তেল দেয় না। আমাকে যেন আপন জনের চেয়ে অধিক যত্ন করতে লাগল। বিভাও যে একটা দারুণ আঘাত পেয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ক্রমে দিনগুলো বিভা আর শ্যামলীর যত্নে কেটে যেতে লাগলো। বাবার কাজের ঠিক তিন দিন পূর্বে পার্টির সেক্রেটারী ভূপেনদার কাছ থেকে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল। আমাকে রাত্রি ন'টার সময় কামার-পুকুরের চৌমাথায় অপেক্ষা করতে হবে। ন'টা পনের থেকে তিরিশ-এর মধ্যে একটা আলুভর্ত্তি ট্রাক এসে আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। ট্রাকে যে থাকবে ব্যাজ দেখালেই সে তুলে নেবে আর তার কাছেই নির্দেশ দেওয়া থাকবে পরবর্ত্তী কোন্ জায়গার গিয়ে আমি

আত্মগোপন করবো। ইতিপূর্বে মায়ের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছিল এবং পুলিশ দু'বার বাড়ী সার্চ্চ করে গেছে এবং মাকে বারবার প্রশ্ন করেছে আমি কোথায়। মা 'জানি না' ভিন্ন অন্য কোন কথা বলেন নি। বাবার মৃত্যুর দিন অচিন্ত্যর মুখেই শুনেছিলাম বাঁকুড়া আর পুরুলিয়াতে আরও দু'টি এ্যাকসান নেওয়া হবে। পরে ভূপেনদার লেখা চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম পুরুলিয়ায় এ্যাকসান ঠিক ঠিক হয়নি। সুখেন ধরা পড়েছিল। আত্মহত্যা করে পার্টির সেক্রেসি রক্ষা করেছে। পুলিশের ব্যর্থতার জন্য সরকার ক্ষুব্ধ। পুরুলিয়ার ডি. এস. পি. কে অন্যত্র ট্রান্সফার করা হয়েছে। কলকাতা থেকে গোয়েন্দা আনা হয়েছে নূতন করে। আমাকে তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে।

টেলিগ্রাম যখন পেলাম তখন বেলা চারটে। টেলিগ্রাম পেয়েই আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। অশৌচ অবস্থায় কোথায় কিভাবে কাটাবো এটা আমাকে বিশেষ ভাবে চিন্তামগ্ন করল। তবুও পার্টির স্বার্থে যেতে আমাকে হবেই এটা আমি ভালভাবে জানি। খবর পাওয়া মাত্র শ্যামলী ছুটে এল, সঙ্গে বিভাও। আমি সদর ঘরে চেয়ারে বসে গভীর চিন্তা করছিলাম। শ্যামলীর ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ল।

শ্যামলী বলল—আর তিনটে দিন এখানে থেকে যেতেই হবে। আপনি কোথাও বের হবেন না। আমরা গ্রামের সবাইকে বলব আপনি চলে গেছেন।

আমি বললাম—শ্যামলী তুমি বোঝনা বাতাসেরও কান আছে, দেওয়ালেরও চোখ আছে! হয়ত তোমাদের গ্রামেই এমন কেউ আছে যে গোপনে সরকার পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। ভূপেনদার কথায় বলি—বিপ্লবীদের কোন যায়গায় বেশী দিন থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষ করে কোন এক বাড়িতে। তাছাড়া ভূপেনদা যখন টেলিগ্রাম করেছেন তখন সব কিছুর খবর তিনি পেয়েছেন। নিশ্চয় এই গ্রামেরই যে হোক গোপনে সংবাদ প্রেরণ করেছে।

এইভাবে যখন আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল তখন মেশোমশায় হন্তদন্ত

হয়ে ছুটে এলেন। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—'বাবাজী তাড়াতাড়ি এ-স্থান ত্যাগ কর। তিনজন কনষ্টেবল আর ও, সিকে আসতে দেখলাম। আমার কেমন যেন মনে সন্দেহ হল। ওরা দাঁড়িয়ে—একজন লোককে কি জিজ্ঞেস করছিল। আমি দূর থেকে গা আড়াল দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম। তারপর ওরা একটু এগিয়ে এলে পরে লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ওরা আমারই বাড়ির কথা বলছিল। আমি সাইকেলে করে তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম, ভাগ্যিস সাইকেলটা ছিল। অশোককে কেন যে আজ পাঠালাম!

মেসোমশায়ের কথা শুনে সকলে ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম! আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে বললাম—শ্যামলী সত্বর আমার ব্যাগটা নিয়ে এস।

বিভাকে বললাম বোমাগুলো রেডি করতে। প্রয়োজনে এ্যাকসান হবে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। যেমন করে হোক গা ঢাকা দিয়ে পালাতেই হবে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল শ্যামলীদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা বড় পুকুর আছে। পুকুরটার পাড়ে ঝোপঝাড়, তারপরেই বিস্তীর্ণ ধান ভর্ত্তি মাঠ।

গোটা বাড়িটাতে যেন নীরবহীন ছোটাছুটি পড়ে গেল। শ্যামলী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছুটে গেল আমার সাথে উপরের শোবার ঘরে। শ্যামলী যে আমাকে ভালবেসেছে তা আমি পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলাম। হায়—নির্বোধ! ভালবাসা নামক বস্তুটা যে আমার জীবনে সোনার পাথরবাটী তা ঐ প্রাণ চঞ্চলা ষোড়শী কি ভাবে জানবে! আর এ ভালবাসা যে নিজেকে পলে পলে দগ্ধ করা তা মেয়েরাই বোধ হয় ভালভাবে জানে। যখন মন চায়, প্রাণ চায় অথচ চাইলেও দূরে থাকতে হয়—তখন যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা মনের মধ্যে মনের স্নায়ুগুলোকে দিনের পর দিন দুর্বল করে দেয়, রাগে ক্ষোভে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলতে থাকে মনের গহনে, তা মনে হয় ভুক্তভোগী প্রেমিক-প্রেমিকারাই জানেন। আমি বহুবার শ্যামলীর বহু ইঙ্গিতে সেটা ভালভাবেই বুঝতে

পেরেছিলাম। তবুও না বুঝার ভান করে প্রায় দেড় মাস কাটাতে হয়েছে। বিভার বয়স হয়েছে। বিভা চতুর, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী। শ্যামলমাটির বুকে ষোড়শী শ্যামলীর সে বুদ্ধিটুকু ছিল না। তবে, বিধাতার আশীর্বাদে মেয়েরা যে কী ভীষণ চাপা—তা প্রমাণ পেয়েছিলাম।

বিভা ব্যাগ নিয়ে উপরে উঠে এল। শ্যামলী কোন কথা বলছিল না। শ্যামলীর নীরব অশ্রুপাত আমাকে সত্যিই সে মুহূর্তে কিছুটা দুর্বল করে তুলছিল। সব সময় ভূপেনদার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করছিলাম। বিভা ব্যাগটা হাতে দিয়ে বলল—যেখানেই যান, গিয়েই বাবাকে খবর দেবেন। আমি বিভাকে বললাম—কোথায় যেতে হবে তা তোমার বাবা পূর্বেই স্থির করে রেখেছেন। এখন এ রকম কথা অবান্তর। বিভা লজ্জা পেল।

কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে বোমার ব্যাগটা হাতে করে তুলতে যাচ্ছি হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

মেসোমশায় উঠোনের সজনেতলা থেকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সত্বর খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

হঠাৎ পুরনো দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে গেল দেখতে পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে আমি বিভা আর শ্যামলী তখন প্রায় খিড়কি দরজার পাশে এসে হাজির হয়েছি। অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। বিভা এগিয়ে গেল পুলিশগুলোর দিকে। বিভাকে সরিয়ে দিয়ে একজন পুলিশ তখন আমার কাছাকাছি। আমি সত্বর এক লাফে কনষ্টেবলটার ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। বন্দুকটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাঁ হাতে ধরা ব্যাগটা থেকে তাড়াতাড়ি বোমা বের করে চার্জ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল হায় কি করলাম। বোধ হয় বেশী ক্ষতি হবে শ্যামলীরই। শ্যামলী আঃ— বলে একটা বিকট চিৎকার করে উঠল এবং পরমুহূর্তেই 'দাদা পালাও' বলে নিঃশব্দ হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার, আর বোমার ধোঁয়ায় চতুর্দিক আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে পিছন দিকের জঙ্গলটা পেরিয়ে পুকুরে পড়লাম। ভাল সাঁতার জানতাম।

মাত্র দুটো ডুবেই ওপারে গিয়ে উঠলাম। ভয়ঙ্কর চিৎকার, কান্না তখনও আমার কানে আসছে। আমি ধান ক্ষেতের অন্ধকারে দৌড়তে আরম্ভ করলাম।

এভাবে যে কতক্ষণ দৌড়েছিলাম তা আমার মনে নেই। ক্লান্তিতে যখন আর দৌড়তে পারছি না তখন মনে হল—পা জ্বালা করছে। পা-টার দিকে চেয়ে দেখলাম কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তের কথা মনে হতেই সমস্ত শরীরটা বিদ্যুৎ পৃষ্টের মতো হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগেই বোমাচার্জের কথা। শ্যামলী কেমন আঘাত পেয়েছে কে জানে! হয়ত বিরাট আঘাতই পেতে পারে! হয়ত কোথাও কেটে যেতে পারে এমনকি মৃত্যুমুখীও হতে পারে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় মনটা নাড়া দিয়ে উঠল। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হতে লাগল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কি নেমকহারামিই না আজ করলাম! ভগবান করুন—শ্যামলী যেন আঘাত না পায়! তবুও মন মানতে চাইছিল না। কারণ যে অবস্থায় বোমচার্জ করেছি তাতে শ্যামলী বেশী না হয় কম আঘাত পাবেই।

এই রকম ভাবতে ভাবতে একটা গ্রামে এসে পড়লাম। গ্রামের পথ ঘাট আমার চেনা নয়। কোন্ ধার দিয়ে কামারপুকুর এবং কত দূর তাই বা কে জানে! ঘড়ি দেখলাম। রাত প্রায় আটটা। আর মাত্র ঘন্টা দেড়েক বাকি। ন'টা তিরিশের মধ্যে আমাকে যেমন করেই হোক চটিতে পৌঁছতেই হবে। একটু এগিয়ে যেতেই এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হল। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম—দাদা এই গ্রামটার নাম কি?

ভদ্রলোক বললেন—কাঁটালি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এখান থেকে কামারপুকুর চটি কত দূর? কোন দিকে যেতে হবে? ভদ্রলোক বললেন—সামনে মাইল খানেক গেলেই পিচ রাস্তা, পিচ রাস্তা ধরে সোজা মাইল খানেক হাঁটলে

কামারপুকুর চটি। ভদ্রলোক আমার দিকে একটু চেয়ে প্রশ্ন করলেন—কোথা থেকে আসছেন ?

আমি বললাম—কোটাপামা থেকে।

—রাস্তা ভুল করেছেন বোধ হয় ?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

এই বলে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম।

মনের মধ্যে হাজারো রকমের দুঃশ্চিন্তা মাথায় জট পাকাচ্ছিল। মায়ের কথা, শ্যামলীদের বাড়ীর সকলের কথা, বিভার কথা—মনের মধ্যে এদিক ওদিক উঁকি মারছিল। ক্লান্তিতে নেশায় বিভোর লোকের মত হাঁটছিলাম। কিছুক্ষণ আগে সামান্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই রাস্তায় বেশী লোকজন ছিল না। তাই কারও জিজ্ঞাসাবাদে পড়তে হল না। ভদ্রলোক পশ্চিমদিকে যেতে হবে বলে দিয়েছিলেন। তাই পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগলাম। ভ্যাগ্যিস পশ্চিমদিকে বলে দিয়েছিলেন তা না হলে কোন দিকে যে হাঁটতাম কোথায় পৌছতাম কে জানে !

ন'টা বাজতে মিনিট পাঁচেক দেরী আছে কামারপুকুর চটিতে গিয়ে পৌছলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে ভয়ে প্রাণটা উবে গেল। তিনখানা ট্রাক হেথা-হোথা করে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা যে আমাদের ট্রাক তা ঠিক করা আমার পক্ষে তৎক্ষণাৎ কঠিন হয়ে পড়ল। তবে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা ঠিক করে নিলাম। যেটা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমাকে সিডিউল টাইম বলে দেওয়া হয়েছিল ন'টা পনের থেকে তিরিশ। এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছি। হঠাৎ দেখলাম রাস্তার উপর দাঁড়ানো ট্রাক থেকে একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার নেমে এল। এসে আমার নাম ধরে ডাকল এবং সিক্রেট সাইন ব্যাজ দেখিয়ে ট্রাকে গিয়ে উঠল। আমি পিছু পিছু গিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রাকে উঠলাম। পিচ রাস্তায় পৌঁছে আগেই জামা-কাপড় বদলে নিয়ে ফ্রেস হয়ে নিয়েছিলাম। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। কারণ এরকম কত আসছে কত যাচ্ছে।

ট্রাকে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। ড্রাইভার আর কেউ নয় শশাঙ্কদা। পাশে বসে একজন অপরিচিত লোক। বয়স হবে আটাশ কি ত্রিশ। কৃষ্ণকায়, সবল ও দীর্ঘ চেহারা। ট্রাকে ওঠা মাত্রই ট্রাক ছেড়ে দিল। আমার ভীষণ পা ব্যথা করছিল। তাই ট্রাকের পিছনের দিকে হেলান দিয়ে বসলাম। প্রায় সত্তর আশি মিনিট পরে শশাঙ্কদা কথা বললেন—

—পুলিশ গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ

—কখন ?

—সন্ধে ঠিক হয় হয়, এই রকম সময়।

—ওরা ঠিক সময়েই তাহলে পৌছেছিল ! আমাদের একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। তোকে ওখান থেকে দু'একদিন আগে চলে আসতে না বলা।

আমি বললাম—পুলিশ এ্যাটাক করেছিল।

শশাঙ্কদা বললেন—আমিও ঐ ভয়টাই করেছিলাম। কারণ পরে খবর পেলাম তাই ঠিক ঠিক ইনফরর্ম করতে পারিনি। তবে ওদের স্পাই রং ইনফরমেশান্ দিয়েছিল। তাই রক্ষা পেয়ে গেলি।

—রক্ষা ঠিক পাইনি। বোম চার্জ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তা না হলে ধরা পড়ে যেতাম। বিভার মাসতুতো বোন শ্যামলী সিরিয়াস আহত হবে কিংবা মারা যেতেও পারে।

শশাঙ্কদা—বলিস কিরে ?

বিভাও হয়ত অ্যারেস্টেড হবে—তাছাড়া বিভার বাবা, শ্যামলী এবং শ্যামলীর দাদাও এ্যারেস্টেড হতে পারে। কারণ যে ভাবে পুলিশের সঙ্গে এ্যাকসান হয়েছে তাতে তারা কাকেও বাদ দেবে না।

শশাঙ্কদা বললেন—তাহলে তো কালই খবর নিতে হবে শেষ পর্যন্ত কেসটা কোথায় গিয়ে পৌছল।

আমার মনে হয় পুলিশ এ্যারেষ্ট করে ওদের উপর খুব শারিরিক নির্যাতন করবে খবর জানবার জন্যে।

শশাঙ্কদা চিন্তা করে বললেন—হুঁ।

গাড়ি দ্রুত বেগে চলতে থাকে। আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। গাড়ী থামল যখন, তখন প্রায় সকাল। একটু শীত অনুভব করলাম। চতুর্দিক ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ইতিপূর্বে কোনদিন পাহাড় দেখিনি। সামান্য দূরে উঁচু উঁচু জায়গা দেখতে পেয়ে শশাঙ্কদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কোথায় এসেছি? শশাঙ্কদা বললেন—এই জায়গাটা ছোটনাগপুর মালভূমির কাছাকাছি পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত। গ্রামের নাম টেরাকাটা। এখানে বেশীর ভাগ লোক উপজাতি। এখনও আধুনিক সভ্যতার বিশেষ কোন আলো এদের মধ্যে প্রবেশ করেনি। চিরকাল এরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এদের জীবন এখনও ক্রীতদাসের সামিল ভেবে নিতে পারিস। এখানেই তোকে থাকতে হবে। এদের বেশীর ভাগ লোকই কয়লার খনিতে, কলে-কারখানায় কাজ করে। আট ঘণ্টা ডিউটির বিনিময়ে এরা যা পায় তাতে এদের নিজেদের পেটের খোরাক হয় না। যাক্ পরে সবই বুঝতে পারবি!

শশাঙ্কদা আমি হাঁটতে লাগলাম। মিনিট দুই হাঁটার পর আমরা একটা ছোট কুঁড়ে ঘরের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। শশাঙ্কদা ডাকলেন—সোনা। সোনা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। 'জি-বাবু'—বলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। তার সাথে তার বৌও বেরিয়ে এল। তারা বোধ হয় সারা রাত্রি আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। শশাঙ্কদা আমি দুজনেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। লণ্ঠনের আলোয় যা দেখলাম তাতে আমার হৃদয় কেঁদে উঠল। এই উপজাতি মানুষরা যে কি ধরণের মানুষ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক ধারে জীবন ধারণের সাজসরঞ্জাম, আর এক ধারে ছোট একটা খাট। খাটিয়ার

ওপর আমাদের জন্য রুটি মাংস তৈরী করা ছিল। আমাদের বসতে দিল তালপাতার চাটাই-এ। জল-রুটি ধরে দিল। আমি শশাঙ্কদাকে বললাম—আপনি খেয়ে নিন। আমি বেলাতে স্নান করে খাব। শশাঙ্কদা হাতে জল নিয়ে শুকনো রুটিগুলো তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম শশাঙ্কদা ভীষণ ক্ষুধার্ত। বাবার শ্রাদ্ধের আর মাত্র একদিন বাকি। তাই আমি কিছু খেলাম না। শশাঙ্কদা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কিছু বললেন না। খাওয়া শেষ হতেই শশাঙ্কদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—সোনা সব ঠিক আছে? সোনা বললো—সব ঠিক বাবু। কাল রাতেই মিটিং হয়েছিল।

শশাঙ্কদা বললেন—আমি এখন চলি। গুণধর ট্রাকে অপেক্ষা করছে। আমি দিন সাতেক বাদে আসব। তবে গুণধর আমাকে বিষ্ণুপুরে পৌছে দিয়েই চলে আসবে। গুণধর তোদের সঙ্গে এখানে কাজ করবে। নির্দেশ মতো কাজ করে যাস্। মনে রাখিস এই খানই আমাদের সংগ্রামের মূল কেন্দ্র বিন্দু।

এই বলে শশাঙ্কদা উঠে পড়লেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। শশাঙ্কদা আমাকে বললেন—মনকে দৃঢ় ভাবে বেঁধে কাজ করিস। কোন সংগ্রামই ব্যর্থ হয় না। প্রত্যেক সংগ্রামেরই প্রতিক্রিয়া আছে। আমাদের সংগ্রাম শোষনের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, মনে থাকে যেন। আমি কিছু বলার আগেই শশাঙ্কদা আমাদের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন।

শশাঙ্কদা রওনা হবার পর আমার সাথে ভালভাবে সোনার আলাপ হল। সোনা কাজ করে একটা কয়লার খনিতে। ওর বৌও কাজে যায়। এখান থেকে খনির দূরত্ব প্রায় দু-তিন মাইল। ওরা সকাল হলেই কাজে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি ফিরতে প্রায় দিনই রাত হয়ে যায়। কারখানায় প্রায় দশ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। মাইনে মাত্র দু'টাকা। ছু'টি মাত্র সপ্তাহে এক দিন। খনিতে প্রায় হাজারের উপর শ্রমিক কাজ করে। ওদের ইউনিয়ন হয়েছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারী

কারখানার মালিকের ধামাধরা দালাল। তাই সোনা ইউনিয়নের কোন মিটিং-এ যোগ দেয় নি। শুধু সদস্য হয়েই রয়েছে। কারখানার মালিক একজন বাঙালী। বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দাবির জন্যে আন্দোলন চলছে। সোনা একটা নূতন ইউনিয়ন করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। নূতন ইউনিয়ন করবার কথা শশাঙ্কদাই বলেছেন।

নূতন ইউনিয়ন করা মানে আমাদের সমর্থক যোগাড় করা। সোনার বৌ-এর নাম ফুলমতিয়া। ফুলমতিয়া শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে একটা চক্র গড়ে তুলেছে। তারা কত অসহায়, তাদের যেভাবে খাটানো হয় এবং যেভাবে দিনের পর দিন মালিক ও উর্দ্ধতন কর্মচারীদের মনোরঞ্জন করতে হয়—তার একটা সুন্দর কুশ্রী ছবি তুলে ধরেছে তাদের কাছে। বাবুদের খেয়াল খুশী মত নিজেদের অনিচ্ছা সত্বেও শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়, এই সব আদিবাসী মেয়েদের। কেন—কিসের জন্য তারা দিনের পর দিন এভাবে ইজ্জত দিয়ে বেঁচে থাকবে! ফুলমতিয়া সুন্দর করে নিজেদের অসহায় অবস্থার কাহিনীগুলি বুঝিয়ে বলতে পেরেছে মেয়ে শ্রমিকদের কাছে। ফল খুব ভাল হয়েছে। একটা চাপা ক্ষোভ তুঁসের আগুনের মতো জ্বলতে আরম্ভ করেছে। সবই শশাঙ্কদার শেখানো বা বুঝানো। অবশ্য এর মধ্যে এক বিন্দুও স্বার্থ নেই। সবই নিজেদের স্বাধিকারের জন্যে। কারণ মার খাওয়ার দিন শেষ হয়েছে। এবার লড়তে হবে—নিজেদের দাবী আদায়ের জন্যে লড়তে হবে।

ক্রমে দুদিন কেটে গেল। সহজেই সকলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। যে শশাঙ্কদাকে ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিল—সে সোনার মামাতো ভাই গুণধর হাঁসদা। গুণধর শিক্ষিত বেকার। থাকে শালবনীর ধান্য-শোলে। মেদিনীপুর সদর ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত।

বাবার শ্রাদ্ধ ঐখানেই করতে হল। পুকুরে গিয়ে গলার কাছা খুলে সূর্যদেবতাকে সাক্ষী রেখে—বাবাকে পিণ্ড দান করলাম। ব্রাহ্মণ ডাকলাম না। সন্ধ্যায় আহার করলাম। সোনা সবই যোগাড় করে দিয়েছিল

সাধ্যমত। মনকে সান্ত্বনা দিলাম—আমি বিপ্লবী। একের স্বার্থ আমার কাছে তুচ্ছ। বহুর কল্যাণের জন্য আমাদের কষ্ট ও ক্লেশ তৃপ্তিদায়ক।

হাজারীবাগ এখান থেকে বহু দূরে নয়। হাজারীবাগের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। হাজারীবাগ ও আদ্রার ইউনিটের সমস্ত কাজ-কর্ম আমাকেই দেখতে হয়। ধীরে ধীরে আমাকে অনেক কিছুই রপ্ত করতে হয়েছে। এখানে এসে গেরিলা যুদ্ধে সবাইকে শিক্ষিত করা আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে পার্টিতে ঢুকে আমি কঠিন ও কঠোর সংযমে বোমা বানানো, বোমা ছোঁড়া ও গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলাম। তাই গেরিলা ট্রেনিং দিতে অসুবিধা হল না। ভূপেনদা এসেছেন বেশ কয়েকবার। গেরিলা ট্রেনিং দেবার জন্যে বাহির থেকে কিছু লোকও এসেছিল কিছুদিন আগে। আগ্নেয়াস্ত্রও হাতে এসেছে। জঙ্গলে ও পাহাড়ে দু'টি সামরিক ঘাঁটি করা হয়েছে। এখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্রোহ রূপ নেবে বিপ্লবে। ধানবাদ হয়ে এ বিদ্রোহ বাঁকুড়া তারপর ঝাড়গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। শান্তি মজুমদার অর্থাৎ পার্টির প্রধান ( পলিটবুরোর প্রধান ) এ বিদ্রোহ পশ্চিমবাংলা থেকে সব রাজ্যে ছড়িয়ে দেবেন।

কলেজের শেষ সীমা না পেরিয়েও নিজেকে কত যেন—অভিজ্ঞ বোধ করতে লাগলাম। দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের ভারে বয়েসটাকে বেশী মনে হতে লাগল। কাজের ভারে বয়সের সীমা রইল না। সাম্যবাদ যে কি ভয়ানক প্রতিশ্রুতির ধারক ও বাহক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলাম। শ্রমিকদের দ্বারাই যে একমাত্র প্রকৃত বিপ্লব সম্ভব তা বুঝতে পারলাম। আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণী বলতে শুধু কলে কারখানায় কাজ করা মানুষকেই ধরলে চলবে না। খেত মজুর ও মধ্য বিত্তেরও একাংশকে বোঝায়। কারণ ভারত কৃষি প্রধান দেশ। কমিউনিষ্ট দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে বুঝা যাবে কমিউন একমাত্র তারাই হতে পারে, যারা প্রকৃত শ্রমের মূল্যবোধ জানে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে গড়ে ওঠে কমিউনিষ্ট

রাজত্বের ভিত্তি প্রস্তর। আপোসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রকে কব্জা করতে হয়। ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়ার দিকে একবার তাকালেই বুঝা যাবে। ভারতের বামপন্থীরা তার সবটুকু বোঝে না বলেই ভারতবর্ষে এত কমিউনিষ্ট দল।

সবচেয়ে বেশী বিপদ হয়ে দাঁড়ায় যখন দেশের বেশ কিছু সংখ্যক জনগণ বুঝতে পারে না বিপ্লব কিসের জন্য। তাদের জন্যই যে বিপ্লব তা তারা আদৌ বুঝতে পারে না। যদি অধিকাংশ জনগণ বুঝতে পারে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা, তখন বিপ্লব হয় সার্থক। জনসাধারণের সার্বিক সমর্থন ছাড়া বিপ্লব সাফল্য লাভ করে না। দেশের শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের মনকে ঘুরিয়ে রাখে মিথ্যা প্রচারের দ্বারা। বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বলে, পর রাষ্ট্রের দালাল বলে, পর রাষ্ট্রের কাছে দেশের সার্ব্বভৌমত্ব বিক্রীর ভয় দেখিয়ে, শাসক গোষ্ঠী নিত্য নূতন আইন করে। বিপ্লবীদের বন্দী করে জেলে পুরে। অকথ্য অত্যাচার করে এবং হাজারে হাজারে বলি দিয়ে বিপ্লব দমন করবার চেষ্টা করে। তাতেই বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যায় কিছু দিনের জন্য।

নেতাদের গদির লোভ দেখিয়ে, অর্থ দিয়ে অথবা জেলে বন্দী করে, যেন তেন প্রকারেণ বিপ্লব দমন করা হয়। প্রয়োজনে বাহির থেকে হাজার হাজার ভাড়াটিয়া সৈন্যও আনে বিভিন্ন চুক্তিতে পর রাষ্ট্র থেকে। যারা ভিনদেশের বাসিন্দা তারা নির্মম ভাবে স্বদেশী বা বিপ্লবীদের অনায়াসে কোতল করতে পারে।

আমি বিশেষ ভাবে রসদের অনুভব করেছিলাম। রসদ যোগাড়ের জন্য আমাকে গোপনে গোপনে গ্রামাঞ্চলে যেতে হত। সেখানে বিপ্লবীদের একত্রিত করে—বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতাম। আমার মাথার মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল দশ হাজার টাকা। তাই, আমাকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন বেশে যেতে হত। আমি আশ্চর্য ভাবে লক্ষ্য করেছিলাম গ্রামাঞ্চলের মানুষদের ভাববোধ। শিক্ষার অভাব থাকলেও তাদের মধ্যে বুদ্ধির বা জ্ঞানের অভাব আমি

দেখিনি। অভাব দেখিনি বোধগম্য শক্তির। অন্ধকারে আছে তারা কেবলমাত্র অন্ধকারে রাখা হয়েছে বলে। যার যা সামর্থ তাই দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে লাগল। অবশ্য কেউ কেউ যে বিরোধিতা করেনি তাও নয়। তবে তা সামান্য। প্রকৃত ভাবধারা যারা বুঝতে পারেনি তারাই আমাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। এইভাবে আমার ইউনিটকে আমি জোরদার করতে লাগলাম। রক্তে মাংসে আমি তখন অন্য মানুষ। আমি মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি শুধু বিদেশীদের কাছ থেকে। কিন্তু বিদেশীরা যাদের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে গেছে তারা দেশের পুঁজিপতিদের দালাল ভিন্ন আর কিছু নয়। কারণ আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতি অর্থনীতিকে কব্জা করে রেখেছে। তাদের হাতেই শাসনভার। তারা মাল মজুত করে। মালের দাম বাড়িয়ে রাতারাতি মুনাফা লুটে এবং সর্বহারা শ্রেণীকে আরও সর্বহারা করে তুলে। এরাই জনগণকে ভাঁওতা দেওয়ার কল ইলেকশানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা চাঁদা দেয়, আবার নিজের দালালদের দাঁড় করিয়ে, মালের দাম বাড়িয়ে দ্বিগুণ চতুর্গুণ টাকা তুলে নেয়। এই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধেই আমাদের জেহাদ।

## দ্বিতীয় পর্ব

সকাল থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কাজ-কাজ আর কাজ। আমি কাজ-পাগলা হয়ে গিয়েছিলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মায়ের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ত। আগে আমি কোনদিন শান্তিদাকে দেখিনি। দিন দুই আগে শান্তিদা ভূপেনদাকে নিয়ে ঝটিতি কাজকর্ম চেক করে গেলেন। তাদের মুখেই শুনলাম শ্যামলীর শেষ পরিণতির কথা। শ্যামলীর বোমায় ঝলসে যাওয়া দেহটা—হসপিটালে তিনদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা করেছে। অকপটে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় স্বীকার করে গেছে আমার প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসার কথা। বার বার আমাকে খুঁজেছিল। শ্যামল মাটির বুকে শ্যামলী বিলীন হয়ে গেছে—সমস্ত চাওয়া পাওয়া প্রেম ভালবাসাকে পিছনে ফেলে। শ্যামলীর মৃত্যু আমাকে আরও শক্ত করেছে। বুঝতে পেরেছি মানুষ আর তার জীবনের সার্থকতা। শ্যামলীর বাবা, শ্যামলীর দাদা, বিভা সকলেই এ্যারেষ্ট হয়েছিল। বিভা আর শ্যামলীর দাদা এখনও জেল হাজতে। ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন নাকচ করে দিয়েছেন। শুধু জামিন পেয়েছেন শ্যামলীর বাবা।

আজ শান্তিদার ভিয়েতনাম যাবার কথা। রওনা হয়ে যেতেও পারেন। নূতন পদ্ধতিতে গেরিলা ট্রেনিং শিক্ষা নেওয়া এবং সে দেশের সমর্থনের জন্যে শান্তিদার এই সফর।

সকাল হলেই আরম্ভ হয়ে যায় কাজ। একশ'-ত্রিশ খানা গ্রাম আর তিনটে শহরে ক্যাডার মিলেছে প্রায় দু-হাজার। সমর্থন মিলেছে প্রায় চল্লিশ ভাগ লোকের। সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ওরাংও, ভুমিজ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতা ঠিক করা হয়েছে। যার যা কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুণধর আর সোনা দুজনেই এক্সপার্ট।

সোনার বৌ ফুলমতিয়া অদিবাসী মহিলাদের একটা আদর্শ বলা

যেতে পারে। আমাদের সংগ্রাম যদি কোনদিন সার্থক হয়, কোনদিন যদি লাল সূর্যের আভায় সোনা ঝরে-এই দেশের বুকে, কোনদিন যদি শীর্ণ নদী আবার তুকূল ছাপিয়ে, সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা মাতৃভূমিকে গরবিনী করে তোলে, তবে দেশ কোনদিনই ফুলমতিয়ার কথা ভুলতে পারবে না। মায়ের কোলে মা। মাতৃভূমির এই মাকে কোটি কোটি মানব-তু-হাত তুলে শ্রদ্ধা জানাতে হয়ত কোনদিন ভুলবে না।

একটা এ্যাকসান নেওয়া হবে। সেই এ্যাকসানের প্রধানা নেত্রী ফুলমতিয়া। ভি. এন. আর. এ্যাণ্ড কোং এর ম্যানেজারের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটাতে এই এ্যাকসান। মিঃ সত্য পালধি ইউনিয়ন ভেঙে দেবার জন্যে ইউনিয়নের নেতা তুষার টুডুকে মিথ্যা চুরির দায়ে জড়িয়ে পুলিশ দিয়ে এ্যারেষ্ট করিয়েছে। কম করেও বিশজনকে ছাঁটাই করেছে। তুষারের বৌকে লোক দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে রাস্তার ধারে মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে। অর্থ আর নারী মাংস-লোভী কালপ্রিটকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্যে নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক ফুলমতিয়াকে এই অভিযানের নেত্রী ও নায়িকা সাজতে হয়েছে। যেখানে শক্তির দ্বারা কোন কিছুকে পরাভূত করা যায় না, সেখানে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। তাই ফুলমতিয়াকে আজ মিঃ পালধির শয্যা-সঙ্গিনী হবার জন্যে পাঠানো হয়েছে কোলিয়ারীর গেস্ট রুমের গোপন কক্ষে। ফুলমতিয়া মদ্য পানে মিঃ পালধিকে অচেতন করে খুন করবে। প্রয়োজনে নিজের জীবন ও যৌবন বিলিয়ে দেবে। কারণ হাজার হাজার শোষণ-কারীর হোতা যে পালধি, যার পাপাচারে সমস্ত কোলিয়ারীর বায়ু বিষে জ্বর জ্বর হয়ে উঠেছে, যার খাম-খেয়ালীতে হাজার হাজার নিরন্ন শ্রমিক উপবাস করে, তার উচিত-প্রাপ্য তাকে পেতেই হবে। অবশ্য ফুলমতিয়ার সাথে ঝুমুর ও সুকুমার প্রধানকেও পাঠানো হয়েছে। সুকুমার আগেই মিঃ পালধির বিশ্বাস অর্জন করেছে। ঝুমুর ফুলমতিয়ার সঙ্গিনী। সুকুমারই যেন ফুলমতিয়ার মাঝের লোক এইরকম বোঝানো হয়েছে, ফুলমতিয়ার দ্বারা মিঃ পালধিকে। ফুলমতিয়া ভোজালি দিয়ে

মিঃ পালধিকে রাতের তৃতীয় প্রহরে শেষ করলে—চার পাঁচজন লোক মিঃ পালধিকে নিয়ে গিয়ে বড় রাস্তার মাঝখানে ফেলে দিয়ে আসবে। পাশেই ফেলে রেখে আসা হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ তার মোটর সাইকেলটি। প্রত্যেকেই ভাববে মিঃ পালধি এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন।

সন্ধ্যা হতেই ফুলমতিয়া আর ঝুমুর মোটামুটি সাজগোছ করে বেরিয়ে পড়ল। ঝুমুর ফুলমতিয়ার মতো সুন্দরী না হলেও পূর্ণ যৌবনা, লাস্যময়ী। মনটি ও হৃদয়টি ফুলের মতো পবিত্র। সুকুমার ঝুমুরকে ভালবাসে। দুজনেই আমাদের পার্টির এ্যাকটিভ কর্মী। প্রয়োজনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সুকুমারের বাবা এই কোম্পানীর জন্য আজীবন খেটে প্রাণ দিয়েছে। বিনিময়ে হারাতে হয়েছে স্ত্রী-কে। সুকুমার যখন মাত্র তিন বছরের তখন তার মা নিজের আত্মসম্মান বাঁচাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। কারখানার বাইরে বড় ফটকের বট গাছটার ডালে। এ সবই তার লোক মুখে শোনা।

ভি. এন. আর. কোম্পানীর বর্তমান মালিক কাম ম্যানেজার মিঃ পালধি। পূর্বে এই কোম্পানীর একজন বেতনভূক কর্মী ছিলেন। নিজে সু-চতুর কৌশলে মামাকে, মামিকে এবং মামাতো ভাইকে মোটর এ্যাক্-সিডেন্ট করিয়ে নিজেই মালিক হয়ে বসেছেন। শুধু তাই নয়-এমন কু-কর্ম নাই সে জীবনে করেননি। অনেক শ্রমিককে তিনি জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছেন ওভেন চুল্লীতে। নিজের স্ত্রী বিষপান করে মরতে বাধ্য হয়েছে স্বামীর নির্যাতনে। পূর্বতন মালিক রবীনবাবু একজন শ্রমিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তার মহত্বের কথা সকল আদিবাসী ছেলে বুড়োর মুখে মুখে ফেরে।

ঝুমুরের পেটের কাপড়ে বাঁধা পটাসিয়াম সায়েনাইডের শিশি। ফুলমতিয়ার কাছে ছুরি। নূতন রঙে সেজেছে ডাকবাংলো। আজ পালধির জন্মদিন। সকাল থেকে বহু লোক আসছে যাচ্ছে। উৎসব-মুখর ডাকবাংলোয় নাচ-গান-ভোজ সবেরই আয়োজন হয়েছে। খানা-

পিনার সাথে আছে পানাহারের ব্যবস্থা। পালধির মনে ও প্রাণে রঙের ছোঁয়া।

আদিবাসীদের নৃত্যেরও আয়োজন করা হয়েছিল। তার সাথে ছিল মদ, হেড়িয়ার ব্যবস্থা। সন্ধ্যার পূর্বেই অবশ্য এ সবের পালা চুকে গেছে। এখন বাবুর আত্মতৃপ্তির অভিসার। একে একে সকলে বিদায় নিয়েছে। নিয়ন গ্যাসের ঝাড়বাতি আর ঝকঝকে আসবাবের ঘরে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন মিঃ পালধি। ফুলমতিয়া আর ঝুমুরকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল সুকুমার।

ইতিহাস বড় বিচিত্র। আর বিচিত্র বিপ্লবীদের জীবন। যারা পায় না কিছুই—দিয়ে যায় সবকিছুই—তাদের সে ত্যাগ যে কি, তা উপলব্ধি করতে পারে কজনই বা। কত অপবাদ, কত অত্যাচার যে সইতে হয়, তা মানুষের সামান্য মাপ কাঠির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যারা শোষণকারী তারা এদের বলে সমাজবিরোধী, গুণ্ডা, বিভেদকামী, উগ্রপন্থী। সত্যিই কি তাই? এদের ত্যাগ যে কত মহিমান্বিত তা কজনই বা বুঝবে। স্বামী চোখের সামনে দেখে স্ত্রীর পরিণতি, ভাই ভগিনীকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর মুখে, পিতা পুত্র-কন্যার শেষ নিঃশ্বাসে বিচলিত হয়না, প্রেমিক প্রেমিকার, প্রেমিকা প্রেমিকের মৃত্যুতে ফেলে আনন্দাশ্রু, জীবন আর ইজ্জত দিয়ে শেষ করে বিপ্লবীরা সমাজের শোষণকারী শত্রুকে, ছলে-বলে-কৌশলে। লক্ষ্য শুধু একটাই, —শোষণ মুক্ত সমাজ। কেউ তো ভূমি আর ঐশ্বর্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। তবে কেন একজন আর একজনের রক্ত শুষে খাবে! মানুষ গড়েছে সমাজ—সমাজ গড়েনি মানুষ।

ফুলমতিয়া আর ঝুমুরকে দেখে মিস্টার পালধি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বেয়ারাকে দিয়ে খাবার আনার অর্ডার দিলেন। ফুলমতিয়া আর ঝুমুরকে পাঠিয়ে দিলেন গেষ্ট হাউসের দ্বিতীয় কক্ষে। যেখানে বেশ কয়েকটি নিষ্পাপ ফুলের কলি ঝরে পড়েছে অকালে।

ঝুমুর, ফুলমতিয়া আর সুকুমার যখন পালধির ওখানে ঢুকে তখন

সি. আই. সাহেবও পালধির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হয়ত তিনি জন্মদিনে মিঃ পালধিকে সেলিব্রেট করতে এসেছিলেন। সুকৌশলে মিঃ পালধি সি. আই. সাহেবকে বিদায় করলেন। প্রথমে সি. আই. সাহেবকে দেখে তিনজনেই চমকে উঠেছিল। কিন্তু দিনটির গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কারও ভয়ের সঞ্চার হল না। বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। মিঃ পালধি সুকুমারকে খাবারের প্লেট নিজের হাতে তুলে দিলেন। বেয়ারাকে দিয়ে দু'প্লেট পাঠিয়ে দিলেন ফুলমতিয়া আর ঝুমুরের জন্যে। আশ্চর্য এই মানুষগুলো! উপবাসের দিনে যারা সহস্র আবেদনে একবারও চেয়ে দেখে না এদের দিকে, সেই মালিকই আজ বিচিত্র খাবার, যা তারা জীবনেও চোখে দেখেনি, তা বিনা সংকোচে খাতির করে খেতে দিলেন। স্বার্থ এমনই জিনিস!

সি. আই. সাহেব চলে গেলে মিঃ পালধি সিকিউরিটি গার্ডকে আদেশ দিলেন গেষ্ট হাউসের প্রধান গেট বন্ধ করে দিতে। সুকুমারের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে মিঃ পালধি সুকুমারকে ফরেন লিকার অফার করলেন। সুকুমার না-করল না। সামান্য দু-পেগ গলায় ঢেলে এমন ভান করতে লাগল যেন সম্পূর্ণ মাতাল। এ রকম ঘটনা যে ঘটবে তা সুকুমার আগে থেকেই জানত। সে কখনও মদ খেত না। কিন্তু এ্যাকসনের কথা ভেবে প্রায় পনের দিন যাবৎ সুকুমারকে মদ পান করানো হয়েছিল নেশাটা আয়ত্বে আনবার জন্যে। ফুলমতিয়া আর ঝুমুরকেও ঠিক একইভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

সুকুমার নেশার ভান করে প্রথম কক্ষেই শয্যা নিল, মিঃ পালধি ফরেন লিকারের বোতল নিয়ে ঢুকল দ্বিতীয় কক্ষে। যৌবনবতী ঝুমুর আর ফুলমতিয়া সহাস্যে অভিনন্দন জানাল পালধিকে। পালধির রাঙা চোখ রঙীন হয়ে উঠলো। ক্ষুধিত সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলমতিয়ার উপর। বাধা দেওয়া যে মুর্খামি তা ভালভাবেই জানত ফুলমতিয়া আর ঝুমুর। তাই সম্ভোগক্লান্ত মিঃ পালধি যখন বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, তখন ঝুমুর আস্তে আস্তে ছুরি বের করে আমুল বসিয়ে দিল পালধির বুকে।

ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছিল। ঝুমুর পরণের শাড়িটা খুলে চেপে ধরল ক্ষতস্থানে, যাতে বিছানায় রক্ত না পড়ে। পালধির চীৎকার শোনামাত্র গার্ড ছুটে এলো। এসে দেখল সব শেষ। গার্ডকে প্রচুর টাকা দিয়ে বশ করা হয়েছিল। সে গেটের তালা খুলে দিল। রাত তখন প্রায় বারোটা। বাইরে বেশ কয়েকজন ক্যাডার অপেক্ষা করছিল। প্ল্যান মত মাইল খানেক দূরে লাশটা ফেলে রেখে আসা হ'ল মোটর সাইকেলটি সহ। শশাঙ্কদা ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। লাশ আর মোটর সাইকেলের উপর দিয়ে সজোরে ট্রাক চালিয়ে দিলেন। পরে তিনি ঝুমুর আর সুকুমারকে নিয়ে আদ্রায় চলে গেলেন। ফুলমতিয়া খুবই মানসিক আঘাত পেয়েছিল কিন্তু তাকে যেভাবে কংক্রীটের মত গড়ে তোলা হয়েছিল—তাতে এই আঘাত সে সইতে পেরেছিল। প্রয়োজনে বিপ্লবীদের ধন, মান, ইজ্জত সবই ত্যাগ করতে হয়।

ঠিক যে সময় পালধিকে খুন করা হয় তার ঘণ্টা তিনেক আগে পালধির একজন আত্মীয়কে দিয়ে ফোন করানো হয়েছিল, পালধিকে জরুরী প্রয়োজনে কলকাতায় যাবার জন্য, একটা বড় কোম্পানীর শেয়ার কেনার ব্যাপারে। সেই সময় সি. আই. সাহেব কথা বলছিলেন পালধির সঙ্গে। যিনি ফোন করেছিলেন তিনি ছিলেন আমাদের পার্টির একজন বিশিষ্ট ক্যাডার।

সুন্দর এ্যাক্‌সন হয়ে গেল। সকলেই ব্যাপারটাকে এ্যাক্‌সিডেন্ট হিসেবে মেনে নিল। কারখানার কর্মীরা শোকসভা করলো। নূতন মালিক হয়ে এলেন মিঃ পালধির ছোট ভাই। ইউনিভার্সিটির নাম করা অর্থনীতির ছাত্র। তিনি শ্রমিকদের সমস্ত নায্য দাবী মেনে নিলেন। ঠিক হল কারখানার লাভের আশি ভাগ পাবে কর্মীরা। তিনি ভাল-ভাবেই জানতেন দিন বদলের কথা। আমি গিয়ে একদিন আলাপ করলাম। আলাপে জানতে পারলাম তিনি ইউনিভার্সিটিতে আমাদের পার্টি করতেন। কথা দিলেন আমাদের পাশেই তিনি থাকবেন। নামে

মালিক হলেও তিনি নিজেকে একজন শ্রমিক বলেই ভাবেন। কারণ তিনিও চান রেনেসাঁ।

প্রত্যেক পার্টিরই একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু জাতীয় কর্মসূচী থাকে। কর্মসূচী যদি দৃঢ় না হয় তাহলে কোন পার্টিই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। বৃহৎ ভূম্যাধিকারী, বৃহৎ কারখানার মালিক এরাই সবচেয়ে দেশের বড় শত্রু। এরাই চেন প্রথায় সমস্ত দেশকে শোষণ ক'রে থাকে। যতক্ষণ না এরা উৎখাত হয় ততক্ষণ বিপ্লব সংঘটিত হয় না। বুর্জোয়াদের মন্ত্রিসভা চিরদিন কব্জা করে রাখতে চায় নিজেদের অস্তিত্ব বংশপরম্পরায়। নিম্নতন বুর্জোয়ারা সব সময় এই উর্দ্ধতন বুর্জোয়াদের সাথে আপোষ করে চলে। বিপ্লবী জনগণ ও শ্রেণীসচেতন মানুষদের কাছে যদি কর্মসূচীটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবে অংশ নেয়। নিজেদের স্বার্থ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে শেষে একেবারে লোপ পেয়ে যায়। এই জিনিষটা আমি প্রত্যেকটি ক্যাডারকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বীজ যদি প্রকৃত পুষ্ট হয় তাহলে গাছ সবল হতে বাধ্য। প্রকৃত ক্যাডার মানেই এক-একটি মহীরুহ। আমাদের সামরিক ঘাঁটির প্রত্যেকটি বিপ্লবীই ছিল এক-একটি মহীরুহ। তাদের অনুশীলনে এতটুকু ফাঁক ছিল না। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলে তারা কিছুই ভাবত না। প্রত্যেকটি বিপ্লবীই ছিল বেশ শিক্ষিত ও দক্ষ।

পার্টির মধ্যে কিছু কিছু মুখোশধারী বিপ্লবী থাকে। যাদের আমরা বলি প্রতিবিপ্লবী। তারা পার্টির মধ্যে ঢুকে অর্থের লোভে সরকারের অনুগত পুলিশ অফিসারদের গোপন তথ্য সরবরাহ করে। মিঃ পালধির সিকিউরিটি গার্ড সে রকম বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করেছিল। তার প্রতিফল তাকে পেতে হয়েছে। জীবন দিতে হয়েছে বন্দুকের গুলির মুখে।

এখানকার কাজ আমি প্রায় একপ্রকার শেষ করে এনেছিলাম। সোনাকে সম্পূর্ণ ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যোগ্য নেতা রূপে। তাকে এখানকার ভার দিয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে একথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

এই এ্যাকসানের পর ভূপেনদা এসেছিলেন। আমাকে জেলা কমিটির সেক্রেটারী হবার জন্যে বলেছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হইনি। কারণ পদ আমার মোটেই ভাল লাগে না। পদ মানেই মোহ, আমি চাই লক্ষ লক্ষ জনগণকে প্রকৃত আলো দেখাতে।

শান্তিদা এখনও বিদেশ থেকে ফেরেননি। বিদেশে যাবার জন্য তাঁকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। কারণ তিনিই নিষিদ্ধ পার্টির প্রধান। শান্তিদার কথা চিন্তা করলে আমি অবাক হয়ে যাই। পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং অর্থনীতির ফার্স্টক্লাস এম. এ. কিভাবে যে জীবন ধারণ করে তা না দেখলে বোঝা যায় না। কোন খাবার, কোন পোশাক, কোন দুঃখ, কোন কষ্ট তার কাছে কিছুই নয়। যারা শান্তিদার আপনজন ও আত্মীয় তারা তাঁর নাম মুখেও আনে না। কারণ তিনি যে নিষিদ্ধ পার্টির লিডার। আর যারা তাঁকে চিনেছে তারা শুধু তাঁকে লিডার হিসেবে শ্রদ্ধা বা ভালবাসেনি। শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে মানুষ হিসেবেও। বুর্জোয়ারা এবং শাসকগোষ্ঠী আমাদের সি-আই এর দালাল বলে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে মেহনতি মানুষের বুকের রক্তের টাকায় যাদের সাংগঠনিক শক্তির কাজ চলে তারা কি করে অন্য রাষ্ট্রের দালাল হতে পারে। যারা গদি আঁকড়ে ধরে কোটি কোটি টাকার দেশীয় সম্পদ রপ্তানির নান করে, বিদেশী সরকারের মনতুষ্টির জন্য বিদেশে পাচার করে মাত্র এক চতুর্থাংশ মূল্যের বিনিময়ে এবং চতুর্গুন দাম দিয়ে ঘরে তোলে বিদেশী বিলাস দ্রব্য, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছিল তারা কাদের দালাল ? তারা দেশের বন্ধু না শত্রু ? তারা একবার ভেবেও দেখে না যে, আজ যে ভুল তারা করে চলেছে তার ফল ভোগ করতে হবে তাদেরই বংশধরদের।

প্রফেসর লাহিড়ী অনেক কষ্টে জামিন পেয়েছেন। তার বিরুদ্ধে সরকার তেমন কোন যুক্তি দেখিয়ে কেস খাড়া করতে পারেনি। তবে সম্পূর্ণরূপে মগজ ধোলাই করে হাজত থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি

এখন গুরুতর অসুস্থ। বিভার কথা শুনলাম। বিভার উপর নিষ্ঠুর-ভাবে চলছে নির্যাতন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছুঁচ ফুটিয়ে যৌনাঙ্গে পোড়া সিগারেটের ছেঁকা দিয়ে, রুলের বাড়ির গুঁতো পেটে মেরে বার বার চেষ্টা করেছে গোপন খবর বের করবার। বিভা কিন্তু কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। ভূপেনদার বাড়ীতে পুলিশ ভীষণভাবে নজর রেখেছে। তার গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য একজন সি. আই. ডি. নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্যামলীর দাদার উপর পুলিশ এমনভাবে অত্যাচার করছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে এখন পুরো উন্মাদ। মস্তিষ্ক বা ব্রেন বলে কিছুই তার আর অবশিষ্ট নেই। প্রত্যেকদিন কি একটা ইনজেক্‌সান দিয়ে তাকে একেবারে মূক ও বধির করে দিয়েছে। তবুও সে পার্টির গোপন কথা কিছুই বলেনি।

শ্যামলীর দাদা সাদাসিধে যুবক। পার্টির সাথে তার কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তার সরলতার সুযোগ পুলিশ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সরকারকে দেখাতে চেয়েছে তারা কত বুদ্ধিমান এবং কত বড় দায়িত্বশীল অফিসার। বিভা যে ধরনের মেয়ে সে যে সব অন্যায় বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে নেবে না, তা আমি ভালভাবেই জানি। তবে নারীত্ব যে তার অবশিষ্ট নেই সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত। অশোক যখন প্রথম এ্যারেষ্ট হয়েছিল তার মুখ থেকে শুনেছিলাম সরকারের ধামাধরা অফিসারগুলোর ব্যবহার ও নির্যাতনের কথা। অশোককে উলঙ্গ করে বার ঘণ্টা নীচু দিকে মুখ করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। পায়খানার দ্বারে লাঠি ঢুকানো হয়েছিল।

অশোকের বাবা একজন নাম করা এ্যাডভোকেট। তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে হাইকোর্টে কেস করেছিলেন। কোন প্রকারে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বর্তমানে সে অশোক আর নেই। আজ সে পুরোপুরি কর্ম-শক্তিহীন। ভালভাবে লোককে চিনতে ও কথা বুঝতে পারে না।

একজন যায় অন্য জন আসে। অশোকের মত শত শত কর্মী এখন আমাদের পার্টির মধ্যে। ধন্য কমরেড, আর তোমার কর্ম! গর্বিত আমি, তুমি, আমার দেশের মা-মাটি আর মানুষ।

বিপ্লবীযুদ্ধ বা মুক্তি যুদ্ধ আরম্ভ হলে বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া এবং শোধনবাদীরা সমাজ সংস্কারের দিকে ঝুকে পড়ে। এই শোধনবাদীদের সঙ্গে বিপ্লবীদের গুরুতর লড়াই বেধে যায়। এই সময় বিপ্লবীদের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা পুনরায় নূতন পার্টি গঠন করে। এতে বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতি হয়। এমনকি অনেক সময় দেখা যায় বিপ্লব সাফল্য লাভ করে না। মাও-সেতুং এবং লেনিন ও কাস্ত্রোর জীবনেও এইরূপ বিপর্যয় ঘটেছিল। তাই শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবীদের শক্ত সংগঠন গড়া উচিত। যেটা আমি প্রথম থেকেই ভাল-ভাবে বুঝেছিলাম। বিপ্লবীরা থাকবে সব সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত। তারা কোন সময়ই এক সাথে অনেকজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবে না। পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে সব সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। আর শহরাঞ্চলে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও গোপন জায়গায় তাদের ঘাঁটি গড়তে হয়। মিশে থাকতে হয় জনগণের সাথে। যতক্ষণ না জনজাগরণ হয় ততক্ষণ কোনক্রমেই নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করা চলবে না। বিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা যখন দেশ থেকে চলে যায়, তখন তারা এই শোধনবাদীদের হাতেই সুবিধামত সংবিধান রচনা করে ক্ষমতা তুলে দিয়ে যায়, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত ও শক্তিহীন করে।

আমি আরও বুঝতে পেরেছিলাম মুক্তি ফৌজদের দিয়ে প্রথমে সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে, এবং তারপর জনগণের একটা বৃহৎ অংশকে গণফৌজে পরিণত করতে হবে। কারণ মুক্তি ফৌজ ও গণফৌজ ধ্বংস করা সরকারের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। যেটা ঘটেছিল ভিয়েতনামে। দেশের সামান্যতম লোক যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও গেরিলা প্রথায়

সংগ্রাম আরম্ভ করে তবে পুঁজিবাদী ও কায়েমী-স্বার্থান্বেষী সরকার উৎখাত হতে বাধ্য।

গ্রামাঞ্চলের জনগণের সাথে সহজ এবং সরলভাবে মিশতে পারলে সংগ্রাম খুব দ্রুত এগিয়ে চলে। যেটা শহরাঞ্চলে ততটা সহজ নয়। সোনাকে আমি ঠিক এইভাবেই গড়ে তুলেছিলাম। সোনার মধ্যে একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল জনসাধারণের মন জয় করার। ফুলমতিয়ার তো কথাই নাই। সে এখন শুধু একজন কর্মীই নয়—পুরোপুরি কমরেড বনে গেছে। সুকুমার ও ঝুমুরকে কয়েকদিনের জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু মাত্র নিরাপত্তার জন্যে।

আমার হাসি পায় ভারতের কয়েকটি মার্কসবাদী পার্টির কথা চিন্তা করলে। তারা পূর্বে প্রকৃতই মার্কসীষ্ট ছিল। কিন্তু তারা যখন শোধনবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে ক্ষমতায় এল এবং গদির মোহে বুর্জোয়াদের দলে টানল তখনই আরম্ভ হল পতন। পরোক্ষভাবে ধনিক শ্রেণীরই দালাল হয়ে পড়ল। পূর্বেই বলেছি কিছু সুবিধাবাদী প্রতি বিপ্লবী থাকে। তারা এসে ভিড় করলো এই মার্কস্‌বাদীদের দলে। যার ফলে বিপ্লব উবে গেল বাষ্পের মতো। এরা পূর্বে গৃহ-যুদ্ধের কথা, বিপ্লবের কথা বলে কতই না চেঁচাত। অথচ এখন মার্কসের লেবেল গায়ে এঁটে কি সুন্দর গদি আঁকড়ে রেখেছে। অনেক আশা ছিল জনগণের এদের উপর। এরা আজ কোথায়? সর্বহারা ও শ্রমিকশ্রেণীর এক চতুর্থাংশেরও উপকার করতে পারেনি। এরা এখন বাবু কম্যুনিষ্ট। বিপ্লবকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এদের শুভ বুদ্ধি হোক একটুকু আবেদন করি।

ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে আর একজন প্রকৃত সাচ্চা নেতা এসে যোগ দিয়েছেন। ইনি আজীবন দেশের জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। ইনি ভূপেনদার বিশিষ্ট বন্ধু। ভুলবশতঃ কয়েক বৎসর অন্য কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন। ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় ফিরে এসেছেন। ইনি হচ্ছেন সরোজদা—সরোজ দত্ত। সরোজদা এক রাজ্য থেকে অন্য

রাজ্যে প্রত্যেকটি সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সিচুয়েসান অনুযায়ী পার্টির কর্মপন্থা স্থির করে দেন।

দেশের সর্বত্রই ধরপাকড় আরম্ভ হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের বহু বিপ্লবী এখন জেলে। আমাদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি ছোটনাগপুরের মালভূমি এবং জঙ্গলে, যেখানে সহজে পুলিশ যেতে পারবে না। প্রতিপক্ষ মুক্তি যোদ্ধাদের বিব্রত করে তোলে বিশেষভাবে বিমান আক্রমণের দ্বারা। একথা ভূপেনদা এবং শশাঙ্কদা আমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। তাই আমি প্রত্যেকটি মুক্তি যোদ্ধাকে বিমান আক্রমণ হলে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে স্পাই মারফৎ শত্রুপক্ষ আমাদের একটি গোপন ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছিল। আমি বুঝতে পেরে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করে দিয়েছিলাম সমস্ত মুক্তি ফৌজকে অন্য ঘাঁটিতে। একদিনে প্রায় দু'ডজন বোমা নিক্ষেপ করেছিল শত্রুপক্ষ এই ঘাঁটির ওপর। কিন্তু কোন ক্ষতি আমাদের করতে পারেনি। গেরিলাদের সাথে জঙ্গলে ও পাহাড়ে যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষ সুবিধে করতে পারে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই নির্দেশ এসে গেল অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্যে। শত্রুপক্ষ আমাকে এ্যারেষ্ট করার জন্য কলকাতার ও কেন্দ্রের বিশেষ দু'জন সি. আই. ডিকে লাগিয়েছিল। তাই ভূপেনদা আমাকে লোক মারফৎ নির্দেশ পাঠিয়েছেন আমি যেন সত্বর এই স্থান ত্যাগ করে ঝাড়গ্রামে চলে চাই। সুকুমার ও ঝুমুর ফিরে এসেছে আদ্রা থেকে। এখানকার প্রধান দায়িত্ব থাকবে সুকুমার, স্কুলমাষ্টার অবনী হোতা, সোনা, ফুলমতিয়া আর ঝুমুরের উপর। অবনীবাবু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি মোটামুটি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তাঁর একপা খোঁড়া। তবে তিনি একজন প্রকৃত কমরেড, সকল সাধারণ মানুষেরই শ্রদ্ধাভাজন এবং নামকরা প্রবীন শিক্ষক।

এদের সকলের উপর কাজের ভার তুলে দিয়ে আমি রওনা হলাম ঝাড়গ্রামের উদ্দেশ্যে। ফুলমতিয়া আর ঝুমুরকে সত্যিই আমি বোনের

মত ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমাকে যখন তারা ট্রাকে তুলে দিতে এলো তখন আমারও খুব কষ্ট হয়েছিল। বহুদিন একসাথে কাজ করার ফলে তাদের ওপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা যে বিপ্লবী! প্রেম-ভালবাসা, মায়া-দয়া সকলের উর্দ্ধে আমাদের থাকতে হয়। ব্যক্তিস্বার্থ আমাদের কাছে সবচেয়ে নীচ প্রবৃত্তি বলে গন্য হয়। শশাঙ্কদা এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে। কারণ যে কোন রকম উপস্থিত বুদ্ধি ও ড্রাইভে শশাংকদা ছিলেন ভীষণ দক্ষ। শশাংকদাকে দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। তিনি পাঞ্জাবীর পোষাক পরে এসেছিলেন। হাতে খুব বড় স্টিলের বালা ছিল। মাথায় ছিল পাগড়ি, এক মুখ দাড়িতে নেট আঁটা। আর আমাকে পার্টির নির্দেশ মত, সাজতে হয়েছিল ছিন্নবস্ত্র পরিহিত একজন পাঞ্জাবী ট্রাক হেল্পার। তেল ও মোবিলে কালো করা হয়েছিল একটা ট্রাউজার আর গেঞ্জিকে।

বিদায় কমরেড! বিদায় বন্ধু-বিদায়! কার সাথে কবে দেখা হবে জানি না। যে আন্তরিকতা, ভালবাসা আমি প্রত্যেকটি কর্মীর কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা জীবনে ভুলবার নয়। নিজের মায়ের চেয়ে আমি অধিক যত্ন পেতাম ফুলমতিয়ার কাছে। সোনা, সুকুমার যে সব সময় আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল তা আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলাম। এখানকার প্রত্যেকটি আদিবাসীর সহজ সরল ব্যবহার আমাকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। তাই বাবার মৃত্যু, শ্যামলীর মৃত্যু, মায়ের সাথে বিচ্ছেদ, আমি ক্ষণেকের জন্যও অনুভব করতাম না। হয়তো কালের নিয়মে একদিন সমস্তই পরিবর্তন হবে। সেদিন কে-থাকবে আর কে যে থাকবে না, তা কেউ বলতে পারে না।

শ্রমজীবি জনগণের অবস্থার উন্নতিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বই দেশে ব্যবধান হ্রাস করে। একদিকে কোটি কোটি টাকার ক্যাপিটালিষ্ট অন্যদিকে নিরন্ন শ্রমজীবি মানুষ। এ ব্যবধান যতদিন না দেশ থেকে লোপ পায় ততদিন সমাজ ব্যবস্থার

মধ্যে একটা ফ্যাক্লাক থেকেই যায়। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত বড় বড় কারখানা, ব্যবসা, পরিবহন দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে দুর্বল করে। ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ায় ছাড়া কমায় না।

ঝাড়গ্রাম যাবার পথেই আমাদের গ্রাম। ক্ষণেকের জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মায়ের সংবাদ বেশ কিছু দিন হল আমার অজানা। অশোক মাঝে মাঝে আমাকে মায়ের সংবাদ দিত। কিন্তু সে এ্যারেষ্ট হবার পর থেকে মায়ের সংবাদ একেবারে আমি পাইনি। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর অশোক তো আর অশোক নেই। অশোক আমার কলেজের সহপাঠী ছিল। আমিই তাকে পার্টিতে এনেছিলাম। তার বর্তমান অবস্থার জন্য আমি খুবই মর্মাহত। তবে ভুপেনদা আর অশোকের বাবা তার চিকিৎসার জন্য সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা করেছেন। প্রয়োজনে বিদেশে পাঠানোর কথাও ভাবা হচ্ছে।

ষ্টেশনের পাশ দিয়েই গাড়ী ছুটছিল। ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী দীঘলগাঁ বেশী দূরে নয়। মন চাইলেই তো সব কিছু সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। মনে হল মাকে গিয়ে একবার দেখে আসি। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আমার মায়ের মত কত শত শত মায়ের চোখের অশ্রু। সামান্য একমুঠো অন্নের জন্য কত মা তিলে তিলে চোখের সামনেই ছেলের শেষ পরিণতি দেখছে। দূর থেকে তাই মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। অশোকের মুখে পূর্বে খবর পেয়েছিলাম মাকে দু'তিনবার থানায় নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে, হাজারো জেরা করেও আমার সন্ধানের ক্লু খুঁজে পায়নি। মা ছিলেন একজন দৃঢ় চরিত্রের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীর মেয়ে। দাদুকে যখন বৃটিশরা এ্যারেষ্ট করেছিল তখন বহুবার মা বৃটিশদের জেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেই দৃঢ় করুণাময়ী মায়ের মুখ থেকে জেরা করে কোন কথা বের করা সহজ নয়।

গাড়ী ছুটে চলেছে—প্রায় নব্বই/একশ মাইল বেগে। হাজারো

চিন্তার জাল মাথার মধ্যে। নূতন পরিবেশে কিভাবে কাজ করব, ওখানকার মানুষগুলো কি প্রকৃতির—আমাকে তারা কিরূপভাবে গ্রহণ করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। মেদিনীপুর থেকে গুণধরকে পাঠানো হয়েছিল ঝাড়গ্রামে। সে বেশ কিছুদিন হল ওখানে কাজ করছে। তার কিছু কিছু কাজের কথাও আমি শুনেছি। ট্রাক ছেড়ে ছিল রাত্রি বারোটায়। ভোরের আলোয় যখন চতুর্দিক লাল হয়ে এসেছে, লোকজন যখন কর্মমুখর জীবন শুরু করতে চলেছে, পাখীরা যখন নীড় ত্যাগ করে চলেছে আহারের সন্ধানে, তখন গিয়ে প্রবেশ করলাম শাল-পিয়ালের জঙ্গলে। তখনও দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল মাঁদল আর নিশিজাগা আদিবাসী নারী-পুরুষ কণ্ঠের গান। সত্যি পৃথিবী কত সুন্দর—প্রকৃতি কত হৃদয়হারিণী। লাল মাটির বুকে, নিবিড় স্নিগ্ধ শাল পিয়ালের ঘনছায়ায় পাখীর কলকাকলি হৃদয়কে হরণ করে। তাইতো যুগ যুগ হতে মানুষ লালিত পালিত হয়েছে এই স্নিগ্ধ প্রকৃতির অপত্য স্নেহে। তবুও মানুষ কেন মানুষের রক্ত খায়, শোষণ করে! প্রকৃতিতো কারও একার নয়!

পূর্বে কোনদিনও আমি ঝাড়গ্রাম যাইনি। তবে ঝাড়গ্রামের কথা আমি ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মায়ের মুখে শুনেছিলাম। এখানে বেশীর ভাগ লোকই আদিবাসী। তাদের মধ্যে সাঁওতাল, ভূমিজ, লোধারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। এরা একদিকে যেমন সহজ সরল অন্যদিকে তেমনই সিংহের মতো ভয়ঙ্কর। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র আলোও এদের মধ্যে পৌঁছায়নি। পুরো লোধা সম্প্রদায়টাই এখনও দাসের মতো জীবন যাপন করে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে নির্যাতন আর অবহেলার জন্যে দিনের পর দিন এদের সংখ্যা কম থেকে কমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বহু নির্যাতিত আদিবাসী পেটের দায়ে চলে গেছে শহরে, নিজেদের জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে। এদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় দিনমজুরী, বনের ফলমূল, মধু, আর জ্বালানী কাঠ। আদিবাসী মেয়েরাও পুরুষদের মতো সমন দক্ষ। তারাও জঙ্গলে

পুরুষদের সঙ্গে কাঠ সংগ্রহে যায়, ক্ষেতে কাজ করে। বহুদিন ধরে জোতদাররা ইচ্ছামতো এদের নিপীড়ন করে আসছে।

শশাঙ্কদা ও আমি ট্রাক দাঁড় করিয়ে নামলাম রাস্তার পাশে একটা ছোট চায়ের দোকানে। গুণধরকে দেখেই চিনতে পারলাম। গুণধর আমাকে দেখে মুচকি হাসল। আমি ভূপেনদা আর শশাঙ্কদার কৌশলের তারিফ করলাম মনে মনে। গুণধর একটি ছোট চায়ের দোকান করেছে জঙ্গলের পাশেই। সেখানে বসে বেশ কয়েকজন আদিবাসী নারী পুরুষ চা-রুটি খাচ্ছিল। সরব রাজনীতির আলোচনাও শুনতে পেলাম তাদের মুখ থেকে। এখানে যে কাজ ভাল রকম আরম্ভ হয়ে গেছে তা বুঝতে পারলাম। শশাঙ্কদা চা খেয়েই ট্রাক ব্যাক করে চলে গেলেন। আমি দোকানে বসে রইলাম। চায়ের দোকানের ভিড় কমে যেতে গুণধর আমাকে একটা কাগজ ধরে দিল। আমি কাগজটা খুলে দেখলাম এক ব্রহ্মচারীর ঠিকানা। গুণধর আমাকে বললো—দাদা আপনি সত্বর এই ঠিকানায় চলে যান সমস্ত ঠিক করা আছে। কাঁধে বোমা ভরতি ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পিস্তলটা সর্টপ্যান্টের পকেটে রেখে হাঁটতে লাগলাম।

সাতটার সময় ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছলাম। বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নাড়লাম। একজন সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গেরুয়া, এক মুখ দাড়ি। পার্টির নির্দেশ মত সিক্রেট সাইন ব্যাজ দেখালাম। তিনিও ব্যাজ দেখালেন। তারপর ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমাকে সেলিব্রেট করে হেসে বললেন, আমার নাম সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রকাশ্যে এ নামেই ডেকো। পরিচয়ে জানতে পারলাম, বাংলায় এম. এ. পাশ করে বাংলার শিক্ষক হয়ে ঝাড়গ্রাম হাইস্কুলে তিন বছর আগে যোগদান করেছেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন আমাদের পার্টিতে এসেছেন। শান্তিদাই তাঁকে এ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। আসল নাম রজত চক্রবর্ত্তী। বাড়ী কলকাতার বরানগরে। বাবা কাজ করেন টাটা কোম্পানীতে।

তবে বাবা ও সংসারের সাথে আজ তিন বছর হ'ল কোন সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মচারীর বেশে তিনি আদিবাসীদের মাঝে সংগঠন গড়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। ভাল সাড়া পেয়েছেন। সংগঠনের শক্তিও বৃদ্ধি হয়েছে। আমাকে এখানে পাঠানোর কারণ, গেরিলা যুদ্ধে বেশ কিছু আদি-বাসীকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠন করা। অস্ত্রসস্ত্র আগেই এসে গেছে। আমাকেও থাকতে হবে ব্রহ্মচারী বেশে রজতদার শিষ্য হয়ে। ঝাড়গ্রামের এস. ডি. পি. ও. একজন কড়া অফিসার। তার নজর এড়িয়ে যেমন করেই হোক এখানে বৃহৎ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। মাস খানেক ট্রেনিং এর পর এ্যাকসান নিয়ে প্রয়োজনে এস. ডি. পি. ও. কে খতম করতে হবে। কারণ এখানকার আদিবাসীরা সাহসী ও শক্তিশালী। তাছাড়া এখানে এত বেশী জঙ্গল আছে যে কাজের ভীষণ সুবিধে হবে। সাঁওতাল ও লোধাদের ট্রেনিং দিয়ে বেশ কয়েকটি বাহিনী গঠন করে অন্যত্র পাঠাতে হবে। রজতদা বললেন, হাত মুখ ধুয়ে টিফিন করে নাও। আজ বিশ্রাম করো। কাল থেকে কাজ আরম্ভ হবে।

# তৃতীয় পর্ব

রাতে রজতদার সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। ঝাড়গ্রামের সংগঠনের কাজের কথার এক এক করে তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিতে লাগলেন। গুণধরের ভূমিকার কথাও তিনি বললেন। গুণধর অদ্ভুতভাবে কাজ করে চলেছে। চায়ের দোকানে আদিবাসী লোকেরা চা খেতে এলে গুণধর তাদের কাছে সুযোগ বুঝে বক্তব্য রাখে। তাদের ন্যায্য অধিকারের কথা বুঝিয়ে বলে। তারা কত অন্ধকারে আছে, অন্ধকারে থাকার কারণ, কি কৌশলে অন্ধকারে রাখা হয়েছে, শিক্ষার কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারাও একজন কোটিপতি লোকের মতো ভারতবর্ষের নাগরিক। তাদেরও সাংবিধানিক অধিকার আছে এবং সে অধিকার তারা জানেনা বলেই তাদের এই দুর্দশা। সুকৌশলে রাজনৈতিক দাদারা তাদের ভোট আদায় করে নেয় হাজার হাজার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আবার গদি পেয়ে গেলেই তাদের কথা ভুলে যায়। সাধারণভাবে বাঁচার অধিকার থেকেও তারা আজ বঞ্চিত। সমস্তই বুঝিয়ে বলে গুণধর। বহু সমর্থক মিলেছে। বুদ্ধিমান ক্যাডারও মিলেছে অনেক। তাদের একমাত্র দোষ তারা নেশা করে। নেশা করলে সমস্ত কিছুই ভুলে যায়। শিক্ষার অভাবের জন্যই তাদের এই দুর্দশা।

আদিবাসীদের মধ্যে অল্প শিক্ষিত যুবক রাজা। রাজা কিস্কু। সত্যিই তাকে রাজা বলা যেতে পারে। অপরিসীম কর্মদক্ষতা। সার্ফব্রেন, বাবা মারা গেছে বছর দুই আগে। বনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। বিষধর সাপের কামড়ে মারা গেছে। কোন চাপান, কোন ঝাড় ফুঁক, কোন গদবাটা সাপের বিষ নামাতে পারেনি। তার বাবা মারা গেছে সংস্কারকে বুকে আঁকড়ে ধরে।

রাজা স্কুলে যেত। রজতদার প্রিয় ছাত্র। বাবা মারা যাওয়ার পর রাজা পড়া ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। রজতদা রাজাকে বুঝিয়ে-

বুঝিয়ে পরীক্ষা দেওয়া করান। ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে। ঝাড়গ্রাম কলেজে পড়ে। কলেজের পুরো সংগঠনের দায়িত্ব তার উপর। রাজা লোকাল কমিটিরও মেম্বার। তার সাহায্যে আদি-বাসীদের মধ্যে জনজাগরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রজতদা সবকিছু জানতেন তবুও আমি তাকে টেরাকাটা ও আদ্রার সমস্ত ঘটনা বললাম। ভি. এন. আর কোম্পানীর কথা, এ্যাকসানের কথা, মিঃ সত্য পালধির অবস্থা প্রভৃতি।

সকালবেলা টিফিন করে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রজতদার সৌম্যকান্তি চেহারা, গেরুয়া বসন দেখে আমার বার বার মনে পড়ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কথা। রতজদার হাতে ওষুধের ব্যাগ, গলায় স্টেথস্কোপ। রজতদা সকালে আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে ঘোরেন, রোগী দেখেন, হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেন। দশটার পূর্বেই বাসায় ফিরে স্নান খাওয়া সেরে স্কুলে যান। রাতের অন্ধকারে গোপন মিটিং করেন। নিজের শরীরের কথা একবারও ভাববার সময় পান কিনা সন্দেহ। আমাদের বিপ্লবীদের জীবনটাই এই রকম। শাল-সেগুন-মহুয়ার বনের পাশেই তালপাতা ও খড়ের ছাউনি দিয়ে ঢাকা বস্তির মতো ছোট ছোট মাটির বাড়িগুলি দেখলে নয়ন জুড়িয়ে যায়। কাঁকুরে লাল মাটির বুকচিরে সর্পিল পথে ক্ষীণ গতিতে বয়ে চলেছে ঝর্ণা। যা আদিবাসীদের পাণীয় জলের অভাব মেটায়।

গ্রামে ঢোকার মুখে রজতদাকে ও রাজাকে দেখে সোল্লাসে কয়েকটা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে ছুটে এল। রজতদা পকেট থেকে লজেন্স বের করে বাচ্চাদের দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে বললেন —জানিস্, এদের মনটা সরল, কিন্তু জীবনটা জটিল। প্রথম প্রথম কেউই ওষুধ খেতে চাইত না। কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মোড়ল মাতব্বরি করে দল পাকিয়েছিল। তাই প্রথমে আমাকে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল। এখন অবশ্য সে ধারণা কিছুটা পালটেছে। দেখছিস্ না, ছেলে মেয়েগুলোর অবস্থা। কেমন সব অ-পুষ্টিতে ভুগছে।

বাচ্চাগুলোকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল শহরের বাবুদের সঙ্গে এদের জীবন ধারণের ফ্যারাকটা। শীতে এদের একটা জামা জোটে না, রোগে জোটে না ওষুধ, দু-বেলা দু-মুঠো মোটা ভাত মাসে কদিন জোটে কে জানে! অথচ এদেরই মতো শিশুরা কনভেন্টে পড়ছে, চব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়তে হাবুডুবু খেয়ে এয়ার-কুলার ঘরে বাস করছে। এই আমাদের স্বাধীনতা। এই আমাদের সমাজ। এদের বুকের রক্তেই গড়ে উঠছে ইমারত। জীবনধারণের রসদ।

গ্রামটার নাম শালতোড়। রাজা আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের গ্রামটা দেখাল। এমনকি তার নিজের ঘরটিও। কয়েক মাইল দূরে মহকুমা শহর। এদের অবস্থা দেখে সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছিল। এরা কত অসহায়। কত নিরীহ। অথচ এয়ার-কুলার বাড়ির বাবুদের ভুক্তাবশেষটুকুর কিঞ্চিৎ মাত্র যদি এরা পেত তাহলে হয়ত অসময়ে অনেক কচি-কাঁচা প্রাণ ঝরে যেত না। আর একবার শপথ নিলাম লাল মাটি চুমে এদের রাক্ষসপুরী থেকে বাঁচাবার। জীয়ন কাঠির সন্ধানে মনকে বিস্তারিত করলাম।

ফিরে আসতে আসতে রজতদার সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'লাম। আমাদের নামে, আমাদের সংগঠনের নামে কত না মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে শাষক গোষ্ঠী। জনগণের মন বিষিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে। গণ মাধ্যমগুলিকে ( সংবাদপত্র, রেডিও, টি. ভি. ) নিজেদের হাতের কব্জা করে রেখেছে। শতশত গুপ্তচর ( আই. বি., সি. আই. ডি. )-কে হাজার হাজার টাকা দিয়ে পুষছে আমাদের সংগঠনের গোপন খবর সংগ্রহ করার জন্যে। কিছু কিছু গোয়েন্দাকে আমাদের সংগঠনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে টাকার লোভ দেখিয়ে গোপন খবর সংগ্রহ করতে। অথচ যে সব বহির্দেশীয় গুপ্তচররা আমাদের দেশকে দুর্বল করে দেবার জন্য, দেশকে খণ্ড খণ্ড করার জন্য, দিনের পর দিন আমাদের দেশের খবরাখবর তাদের দেশে সরবরাহ করছে কুটনীতিবিদের মুখোশ পরে,

দূতাবাসের মাধ্যমে, আমাদের দেশের বীরপুঙ্গব গোয়েন্দারা তাদের বিরুদ্ধে একটি কমপ্লেনও প্রমাণ করতে পারেনি।

বিদেশীরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যে, আমাদের দেশকে তাদের দেশের স্তাবক বানাবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশের বিরোধী সংগঠনের নেতারাও এই খবর রাখে। কিন্তু দীর্ঘদিন তারা ভুলপথ ধরে থাকার জন্যে একমাত্র বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভার আসন জোড়া করে শোভাবর্দ্ধন করছেন। এমন অনেক বিরোধী পার্টি আমাদের দেশে আছে যারা ক্ষমতার লোভ ত্যাগ করলে আজ ভারতবর্ষের বুকে সোনা ঝরা সূর্যের আলো পড়ত প্রতি প্রভাতে। আরও এক সমস্যা হাজারো নূতন পার্টির জন্ম। একটি দল ভাঙছে দশটি দল গজাচ্ছে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? এ সাধারণ কথা। শাসক গোষ্ঠীর কৌশল। গদি শক্ত করা।

মানুষ মার খায়। মার খেতে খেতে, পিছু হঠতে হঠতে, যখন দেওয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকে তখন—সামনের দিকে এগিয়ে আসে। আর তখনই এক এক গোষ্ঠী বা শ্রেণী বিদ্রোহ করে শাসক দলের বিরুদ্ধে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ইংরেজ আমলের সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। তখন শাসক গোষ্ঠী মেরে-ধরে পিটে বিদ্রোহ দমন করবার চেষ্টা করে। দেশের বুদ্ধিজীবিরা যদি এই সব বিদ্রোহীদের পিছনে সমর্থন নিয়ে দাঁড়াত, তাহলে হয়ত বিদ্রোহ কিছুটা সফল হত। কিন্তু দেখা যায়, যখন বিদ্রোহ হয় তখন গণ-মাধ্যমগুলি বিশেষ করে খবরের কাগজ ও রেডিও এমন প্রচার চালায় যে, জনগণ বোঝে বিদ্রোহীরাই দোষী। সরকারের মদতপুষ্ট খবরের কাগজের লেখকরা দিব্যি এদের বিরুদ্ধে সরকারের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখে এবং ভুল সংবাদ ছাপে। সাম্প্রদায়িক, উগ্রপন্থী ও বিভেদকামী বলে জনমানসে তুলে ধরে। কিন্তু তারা একবারও ভাবে না যে আজ যা তারা করছে ভবিষ্যতে সেইটাই বুমেরাং হয়ে তাদেরই বুকে এসে বিঁধবে।

ছদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। অবাধে-স্বচ্ছন্দে ঘুরছি। মনেই

নেই যে আমার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে দশ হাজার টাকা। কথাটা সন্ধ্যাবেলায় মনে করিয়ে দিলেন রজতদা। অতএব ছদ্মবেশ। আমার কাজের কথা বুঝিয়ে দিলেন। গুণধরের চায়ের দোকানের পাশেই একটা দোকান খোলা হ'ল। দিনের বেলা কাজ হ'ল দোকান চালানো। রাতে সংগঠনের কাজ—মুক্তি ফৌজদের শিক্ষা দেওয়া। দোকানের ক্যাসিয়ার কাম মালিক হয়ে বসে গেলাম। হেঁড়িয়ার দোকান। হেঁড়িয়া বিক্রী করার ফাঁকে ফাঁকে—আমাকে ক্যাডার যোগাড় করতে হয়। রাজনীতির কথা, সুখ দুঃখের কথা উঠলেই আদিবাসীদের কাছে গল্পের ছলে—তুলে ধরি বক্তব্য। চমৎকার যুক্তি, সুন্দর কাজ।

পনের দিনের মধ্যেই অনেক লোক পাওয়া গেল! প্রফেসর লাহিড়ী ট্রান্সফার নিয়ে এলেন! ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। রাজার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হ'ল প্রফেসর লাহিড়ীর সঙ্গে। ইতি-পূর্বে একটা ছোট সংগঠন গড়া হয়েছিল—সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ প্রভৃতিদের নিয়ে। এখানে ইণ্ডাষ্ট্রী নেই। তবুও সংগঠন খুব জোরদার হয়ে উঠল। বেশ কিছু নিম্নমধ্যবিত্ত, গরীব খেটে খাওয়া লোকের সমর্থনও পাওয়া গেল। রজতদা বিভিন্ন গণসেবাসমিতির মাধ্যমে বহুদিন ধরে গরীবদের সেবা করে চলেছেন। এখানে রজতদাকে অধিকাংশ লোকেরাই একজন নির্লোভ সমাজসেবী হিসেবেই মনে করে, তাই তাকে এখন আর পূর্বের মতো কাজ করতে কোন বেগ পেতে হয় না।

মহকুমার অধিকাংশ এলাকাতেই গভীর জঙ্গল। জঙ্গলের তিনচার মাইল ভিতরে ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছে। অস্ত্র-সস্ত্রও মজুত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন এ্যাকটিভ কর্মীকে এনে রাখা হবে এই ঘাঁটিতে। দু'জনে মিলে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে এখানকার সংগঠন খাড়া করতে হবে। জঙ্গলে প্রবেশ করার কোন পথ করা হয়নি। যে সব পথ দিয়ে আদিবাসীরা ফলমূল, মধু, কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করতে যায়

সেই সব পথ দিয়ে প্রথমে জঙ্গলে ঢুকতে হয়। তারপর সরু পথ। সরু পথ পার হলেই গভীর জঙ্গল। ভিতরে জঙ্গল এত ঘন যে হিংস্র জন্তু ও সাপখোপের ভয়ে সচরাচর আদিবাসীরা ঢুকবার সাহস পায় না। তাই মাইল খানেক পথ গাছ কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। যদি কোনদিন শত্রুরা ঘাঁটির সন্ধান পায় এ্যাকসানের সুবিধা হবে। ঘাঁটির পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে ঝর্ণা। জলেরও অভাব নাই।

গতকাল রাত্রে রজতদার সঙ্গে ঘাঁটি অর্থাৎ আমাদের ঝাড়গ্রামের গোপন শিবির দেখে এলাম। দু'-এক দিনের মধ্যে আমাকে ওখানে চলে যেতে হবে।

দিন এগিয়ে চলে কাজও এগিয়ে যায়। বিভা ছাড়া পেয়েছে। শ্যামলীর দাদার একবছর জেল হয়েছিল। ছাড়া পাবার পর তাকে উন্মাদদের কারাগার রাঁচিতে রাখা হয়েছে। শ্যামলীর বাবার মৃত্যুর খবরও শুনলাম। শুনে খুব মন খারাপ হয়েছিল। আমাকে বাঁচাতেই শ্যামলী প্রাণ দিয়েছে। ছেলের বর্তমান অবস্থা, মেয়ের মৃত্যুশোক তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল হয়ত। তিনি এখন শহীদ। শশাঙ্কদা মাঝে মাঝে আসেন, কাজকর্ম তদারক ক'রে যান। তার মুখেই সব শুনলাম। এখানে এসে থেকে মায়ের কোন সংবাদ পাইনি। শশাঙ্কদার মুখে মায়ের খবর পেলাম। আমার জন্য এখন তার দুঃখ হয় কিনা জানি না। তবে মা যে চরিত্রের মেয়ে, তিনি যে ভেঙে পড়বেন এ চিন্তা আমি করিনি। কারণ বিপ্লবীর রক্তে তাঁর জন্ম।

শাল পিয়ালের বনে পাখীদের কলকাকলিতে সকাল হয়। শিশির ঝরা সকালে বনশিউলি-ক্যাকটাস-রোডোডেনড্রনের মিষ্টি গন্ধে মনটা উদাস হয়ে যায়। প্রভাত সূর্যের আভা লাল মাটিকে আরো লাল করে তুলে। সদ্যাগত যুবতীর যৌবনের মতই দুর্বার ডগায় খেলা করে রামধনুর সাতটি রঙ। যত দেখি তত মনে হয় এই সকাল, এই সূর্য, এই বনভূমি কারও তো একার নয়। কারও তো জন্মগত অধিকার সূত্রে পাওয়া নয়। তবে কেন এত লোল-জিহ্বা রক্ত শুষছে দিনের পর দিন?

কেন ইচ্ছে করে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে মানুষ মানুষকে ? মানুষ কি ভয়ানক প্রজাতি ! বন্য প্রাণীর চেয়ে হিংস্র, সর্পের চেয়েও ক্রুর !

শীতের সন্ধে। পশ্চিমদিগন্তে একটা টিলার নীচে শিশুর হাসি হাসতে হাসতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনভূমির রহস্যময় পরিবেশ। মনভোলানো মনমাতানো আবেশ। পাখীরা বিভিন্ন কলরব করতে করতে নীড়ে ফিরছে। দূরে মাদলের শব্দ শোনা যাচ্ছে—ধিতাং-ধিতাং···। বাসে চড়ে শহর ছেড়ে প্রায় মাইল দশেক দূরে, এল. সি.-র একটা গোপন মিটিং-এ এ্যাটেণ্ড করতে যাচ্ছি। মুখ ভর্তি দাড়ি। পরনে ছাপা লুঙ্গি। হাতে মোটা স্টিলের বালা। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না, আমিই সেই দীঘল গাঁয়ের উদ্‌ভ্রান্ত কলেজ পড়ুয়া যুবক। সঙ্গে গুণধর, রজতদা আর সাতজন ক্যাডার। গুণধরের হাতে একটা ময়লা ব্যাগ। তাতে কম হলেও আট দশটা বোমা। আমার কোমরে ডবল্ বোরের পিস্তল। রজতদার কাছেও ডবল্ বোরের পিস্তল। বাকী সবার কাছে ছোট পিস্তল।

আমাদের কাছে খবর এসেছে আমাদের ধরবার জন্য নামী সি. আই. ডি. অফিসার এসেছেন। ঝাড়গ্রামের এস. ডি. পি. ও-র এদিকে নাম আছে অফিসার হিসেবে। তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

মাইল দুই চলার পর বাস এসে থামল একটা স্টপেজে। জন-দুই লোক গাড়িতে উঠলো। একজন পাঞ্জাবী, অপরজন আদিবাসী। বাস ছেড়ে দিল।

এগিয়ে চলেছি। পথে মাইল দুই কোন বন জঙ্গল নেই। উঁচু নীচু রাস্তা। ছোট ছোট টিলা এখানে ওখানে। বর্তমানে কিছু কিছু জায়গায় পাথর কেটে পটল, আলু, গম ও যবের চাষ হচ্ছে। মাটি ও পাথর কেটে কুঁয়ো তৈরী ক'রে তার থেকে জল তুলে সেচ দেওয়া হয়।

এখানে আসার পর আমি এই পথ দিয়ে আরও বার দুই গিয়েছি। গ্রামটার নাম—তালমুণ্ডি। বড় গ্রাম। অধিকাংশই আদিবাসী। মাত্র

দু'জন জোতদার এই অঞ্চলের প্রায় ন-দশখানা গ্রামের জমির মালিক। খুব অল্প বেতনে আদিবাসীদের দিয়ে খাটিয়ে নেয়, ফসল লাগানো ও ঘরে তোলার সময়। বাকী সময়—আদিবাসীরা বেকারই থেকে যায়। কোন সম্পর্কই থাকে না এদের সঙ্গে। এই দুই—জমিদারতুল্য জোরদারদের মধ্যে একজন আবার বর্তমান সরকারের বিধানসভার সদস্য। অপর জন—অর্থবান, গুনহীন, চরিত্রহীন। এহেন কুকার্য নাই তিনি জীবনে করেন নি। এই সব কথা ভাবছিলাম বসে বসে। হঠাৎ গ্রাকে ঢোকার মাইল খানেক আগেই একটা গাড়ী পিছন থেকে দ্রুতবেগে এসে বাসটার পথ আটকে দিল। গাড়ীর আলোয় বুঝতে পারলাম পুলিশ ভ্যান। চকিতে সংকেত জানালাম হাত মুঠো করে সকলকে। সকলের সঙ্গেই চোখাচোখি হলো। বুঝতে পারলাম সকলেই প্রস্তুত।

ভ্যান থেকে নেমে—কয়েকজন পুলিশ গাড়ীতে উঠতে যাবে হঠাৎ এক সঙ্গে কয়েকটা রিভলবার গর্জে উঠল দ্রাম্—দ্রাম্—দ্রাম্। প্রতিপক্ষ ফায়ার করবার আগেই দেখতে পেলাম বাস চলছে। বাস ড্রাইভার সেই নবাগত পাঞ্জাবী, যিনি আগের ষ্টপে বাসে উঠে ড্রাইভারের বাম-পাশের সিটে জায়গা করে নিয়েছিলেন। যাত্রীদের কান্না আর চীৎকার বাসের গর্জনকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল। আমি ধমকে সকলকে চুপ করালাম। প্রতিপক্ষের যে পুলিসটি প্রথমেই গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টা করেছিল, গুলি খাবার পর তার দেহটা বাসের মধ্যেই রয়ে যায়। রজতদা টেনে তুলে নিয়েছিলেন। বাকীদের মধ্যে চার পাঁচজন গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। দেখেছিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা বাস চলার পর আমরা যখন শহর থেকে প্রায় তিন চার মাইল দূরে, তখন ড্রাইভার কম্পন এবং ক্রন্দনরত যাত্রীদের নামিয়ে দিলেন। তার গলার আওয়াজে বুঝতে পারলাম—তিনি শশাঙ্কদা। সুকুমারকেও চিনতে দেরী হল না। সমস্তই ম্যাজিক মনে হ'তে লাগল। শশাঙ্কদা ফায়ার ক'রেই ড্রাইভারকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দ্রুত ষ্টার্ট করে

বাস ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষ এতটা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সুকুমার বোমা মেরে ছিল ভ্যানে। আমি ও আমার সঙ্গের সকলেই এক সঙ্গে ফায়ার করেছিলাম। লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। ড্রাইভার কন্‌ডাক্‌টার যে যেদিকে পেরেছিল ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

শিবিরে ঢোকার মুখে বাসটাকে বনের মধ্যে একটা খাদে ফেলে দেওয়া হ'ল। সকলে মিলে আহত পুলিশটিকে আমাদের গোপন শিবিরে নিয়ে গেলাম। কপালে পায়ে ও হাতে গুলি লেগেছিল। রক্ত ঝরছিল। শিবিরের মধ্যে আলোতে পুলিশটিকে দেখে আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে ও ভয়ে প্রাণ উবে যাবার উপক্রম। পুলিশটি অফিসার। পকেট হাতড়ে আইডেনটিটি কার্ড পেলাম। এস. ডি. পি. ও। ইতিপূর্বে অনেকবার দেখেছি—অলোক দাশগুপ্তকে। আমাদের গ্রামে—দীঘলগাঁয়ে। দীপালির হ্যাস্‌ব্যাণ্ডের পরিচয়ে। শিবিরের ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি অপারেশন করে গুলি বের করার জন্যে অনুরোধ করলাম। নিজেই মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম।

প্রতিপক্ষের শাস্তির কথা মনে পড়লেই আমার গা শিউরে উঠতে লাগল। অলোকবাবুকে যে কিভাবে রক্ষা করি ভেবে পাচ্ছি না। দীপালি বিধবা হবে এ আমি কল্পনাও করতে পারছি না। জীবনে কাকেও কিছু দিতে পারিনি। শ্যামলী একবুক গর্ব নিয়ে আজ শহীদ। বিভার কাছে হেরে গেছি। দীপালি? দীপালিকেও কি বিধবা দেখতে হবে?

আমার বয়স তখন আট কি নয়। একবার বর বউ খেলা হচ্ছে। আমি বর, দীপালি কনে। বিয়ের পর আমি মরার ভান করে শুয়ে পড়েছিলাম। দীপালির সে কি কান্না। কেউ থামাতে পারে নি। যখন বসন্ত আসে। কাকেও বলে আসে না। দীপালি আমি এক-সঙ্গে হাইস্কুলে পড়তে গেছি। ধীরে ধীরে দীপালির দেহেমনে বসন্ত এসেছে। বসন্তের সেই প্রথম অর্ঘ সে আমাকে অকৃপণ ভাবে উজাড়

করে দিতে চেয়েছিল। আমি নিতে পারি নি। ক্লাসে ফার্স্ট হ'তাম। দীপালি আসত, আমি হাঁ করতাম, মিষ্টি খাইয়ে দিত। জন্ম দিনের উপহারগুলো আজও দীঘলগাঁয়ের একটি পরিবারের আলমারিতে শোভাবর্দ্ধন করছে। সেই দীপালি যাকে জীবনের প্রথম যৌবনের সমস্ত কিছু অলিখিত অঘোষিত ভাবে অর্পণ করেছিলাম, যার বাবা মা আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করত, ঘুমিয়ে পড়লে নিজের ছেলের মতো বাহুপাশে আবদ্ধ করে বিছানায় শুইয়ে রাখত, তাঁদের মেয়ে দীপালি বিধবা হবে? চিন্তা করলেই মাথাটা টনটন করে ওঠে।

ভূপেনদা, শশাঙ্কদাকে নিয়ে ঐ দিনই আমাদের গোপন শিবিরে আসেন। তাদের আসার ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে আমাদের একজন সোস ( স্পাই ) ঘাঁটিতে গোপন খবর দিয়ে যায়। কিন্তু আমরা কেউ খবর পায়নি, তবে আমাদের ওপর যে কড়া নজর রেখেছে এস. ডি. পি. ও. সাহেব সে খবর জানতাম। ভাগ্যিস ভূপেনদা ও শশাঙ্কদা এসে গিয়েছিলেন। তাই এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল। কিন্তু অলোক বাবুকে রক্ষা করি কি করে? অলোকবাবু যে আমার চেনা এ কথা প্রকাশ হয়ে গেলে হয়ত আমার ও অলোকবাবু দুজনেরই জীবন বিপন্ন হবে।

মানুষ এমনই একটা জীব যার করোটি সবচেয়ে উন্নত। আই কিউ সবচেয়ে বেশী। তাই এই ছোট জীব হাতী-সিংহের মতো বনের হিংস্র পশুকে পোষ মানিয়ে খাঁচায় বন্দী করতে পেরেছে। লক্ষ লক্ষ মাইল রকেটে চড়ে গ্রহ-উপগ্রহকে জয় করেছে। মরুভূমি-সমুদ্রতো আজ একেবারে হাতের নাগালে। সব কিছুকে জয় করতে পারলেও প্রেম ভালবাসা, মায়া-মমতাকে জয় করতে পারেনি। তা থেকে দূরে থাকতে পারেনি। তাই মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধও মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে আশার রোশনাই চক্ষে ধারণ করে—নূতন নূতন স্বপ্নের কথা ভাবে। আমি বিপ্লবী হলেও রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। তাই ক্ষণে ক্ষণে কতকগুলো স্বাভাবিক রিপু আমাকে গ্রাস করতে চায়। কঠোর

হাতে দমন করি। বিপ্লবীদের প্রেম-ভালবাসা-মায়া-মমতা থাকতে নেই ভালভাবে জানি। কিন্তু কর্তব্যবোধ? তাকে এড়িয়ে যায় কেমন করে। আজ যদি অলোকবাবু একজন ব্যাচেলর এস. ডি. পি. ও. হতেন তাহলে কোন অসুবিধে হ'ত না। কিন্তু একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবন যে তার সঙ্গে জড়িত। হয়ত শত-শত দীপালির স্বামী না খেয়ে শোষণের শিকার হয়ে মরছে, কিন্তু তা সত্বেও একটা কর্তব্য-বোধ আমার অন্তঃসত্বাকে নাড়া দিল। অলোকবাবুকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। তবে পার্টির স্বার্থ এতটুকু যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। কারণ সর্বাগ্রে আমার মাতৃভূমির লক্ষ লক্ষ কোটি কোর্টি শোষিত জনগণের মুক্তি। তার পর ব্যক্তি স্বার্থ।

অপারেশন সাক্সেসফুল হ'বার পর মিটিং বসল। মিটিং এর আলোচ্য বিষয় (১) এস. ডি. পি. ও.র প্রতি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, (২) এরপর এখানের পার্টির ভবিষ্যত কর্মসূচী, (৩) এখানের আদি-বাসীদের মুক্তি যুদ্ধের ( গেরিলা যুদ্ধে ) ট্রেনিং সত্বর সমাপ্ত করে অন্যত্র প্রেরণ করা (৪) বেতার কেন্দ্র স্থাপন।

মিটিং এ সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হ'ল যদি এস. ডি. পি. ও. সাহেব আমাদের কয়েকটি সর্ত মেনে নিয়ে স্বেচ্ছায় বদলি হয়ে চলে যান, তাহলে খতম করা হবে না। আমি ভালভাবে অলোকবাবুকে চিনতাম। তিনি একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, সর্বভারতীয় আই. পি. এস. পরীক্ষায় অষ্টম স্থান পেয়ে চাকরিতে জয়েন করেছেন মাত্র বছর কয়েক আগে। চাকরিতে জয়েন করে বিয়ে করেন যে বছর সে বছর আমি কলেজে ঢুকি।

আমি অলোকবাবুকে রাজি করানোর জন্য দায়িত্ব নিলাম। এমন ভাবে কৌশলে বক্তব্য রাখলাম কেউ-উ বুঝতে পারলো না আমি অলোকবাবুকে চিনি বা জানি।

শশাঙ্কদা, ভূপেনদা ভোর হবার আগেই চলে গেলেন। আগামী কাল ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং। কলকাতায় নটার মধ্যে প্লেন

ধরতে হবে। ভূপেনদার মুখে শুনলাম শাস্তিদার কথা। শাস্তিদা ফরেন থেকে ফিরে এসেছেন। দেশের সর্বত্রই সংগঠনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গ্রামাঞ্চলের মতো শহরাঞ্চলেও সংগঠন জোরদার হয়েছে। দেশের বেশ কয়েকটি বিপ্লবী পার্টি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে চলতে চায়। আমাদের পার্টির কর্মসূচী তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে। আমাদের মতো তারাও চাই শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, শোষণ-হীন সমাজ ও রাষ্ট্র। এমন একটা পতাকাতলে আমরা মিলিত হতে চাই যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন সম্পত্তি থাকবে না। আমরা সবাই একটা দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমাদের কর্তব্য ও কাজ দেশের জন্য বা রাষ্ট্রের জন্য। বিনিময়ে দেশ আমাকে দেবে সুখে বেঁচে থাকার সমানাধিকার। পৃথিবী যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন কত পিছিয়ে। তৃতীয় দুনিয়ার এই উপমহাদেশ এখনও যে তিমিরে সেই-তিমিরেই। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি আবার আমাদের ভারতবর্ষকে উপনিবেশ বানানোর চেষ্টা করছে। এদিকে সাধারণ মানুষের অর্থনীতি দিনের পর দিন ভেঙে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার।

দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এখন প্রয়োজন সাধারণ মানুষের চেতনা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রপ্রধান সাম্য, মৈত্রী, জোট নিরপেক্ষতার কথা বলে জনগণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। এমতাবস্থায় প্রয়োজন সম্পূর্ণ জনজাগরণ ও প্রতি বিপ্লবীদের দমন। প্রতি বিপ্লবীরা সব সময় বিপ্লবকে পিছিয়ে নিয়ে যায়। বিপ্লব থেকে বিচ্যুত হয়ে বুর্জোয়াদের দলে ভিড়ে যায় এবং ভোটে অংশ গ্রহণ ক'রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়কদের হাতের পুতুল হয়ে যায়—যা ভুরি ভুরি ঘটছে আমাদের দেশে।

একদিন বাদেই অলোকবাবুর সম্পূর্ণ জ্ঞান এল। তিনি প্রথমে সিংহের মতো গর্জে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—হয় আমাকে মেরে

ফেলুন, না হয় আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। তিনি আমাকে ভাল ভাবেই চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু কোন কথা বলেননি। তবে আমার উপর যে তার প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা জন্মেছিল তা' তার চোখের দৃষ্টিতেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমিও তার কথার সঙ্গে ক্রুর হাসি হেসে ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিলাম—বুর্জোয়া রাজার রাজভক্ত কর্মচারী। ছেড়ে নিশ্চয় দেব, তবে—ছু'চোখ অন্ধ ক'রে এবং মগজ ধোলাই করে। যেমন করেছেন আপনারা আমাদের ক্যাডারদের। তিনি ঠোঁট কামড়ে চোখ ছুটো বড় করে আমার দিকে অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। আমি জানতাম রাগ মানুষের বেশীক্ষণ বা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। আমাদের আদর্শের কথা—আমাদের বিপ্লবের ধরণটি যদি অলোকবাবুর একবার মগজে ঢোকে, তবে তার রাগ নিশ্চয় প্রশমিত হবে।

ছু'দিন বাদে খবরের কাগজ পেলাম। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইন নিউজ—ঝাড়গ্রামের এস. ডি. পি. ও. অপহৃত, উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন কনষ্টেবল নিহত ও তিনজন আহত। এস. ডি. পি. ও.-র স্ত্রীর ছবিও ছাপা হয়েছে। দেড় বছরের শিশুপুত্র কোলে করে ক্রন্দনরত অবস্থায়। সরকার চার ব্যাটেলিয়ান সি. আর. পি. নামিয়েছে। প্রয়োজনে সেণ্ট্রাল থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে এও ঘোষণা করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করার জন্যে। ঝাড়গ্রামের সমস্ত জঙ্গল সশস্ত্র পুলিশ ও সি. আর. পি. ঘিরে রেখেছে। কড়া অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে উগ্রপন্থীরা বন থেকে পালাতে না পারে।

কাগজ পড়ে হাসি পেতে লাগল। বিপ্লবীদের ওরা মানে বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা এই ভাবেই আখ্যা দেয়। উগ্রপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে জনগণকে বোঝাতে চায়। কিন্তু মূর্খ রাষ্ট্রনায়করা জেনেও জানে না আজ আর সেদিন নেই। জনসাধারণ অনেক বেশী রাজনীতির কথা ভাবে। এখন অনেক সচেতনতাবোধ তাদের শিরা উপশিরায়।

যদিও জানতাম কড়া অবরোধ বেশী দিন ওরা জিইয়ে রাখতে পারবে না, তবুও সাবধানের মার নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে রজতদাকে ঘাঁটির রসদের কথা জানিয়ে স্পাই দিয়ে চিঠি পাঠালাম। ভূপেনদাকে ম্যাসেজ করলাম। নূতন প্রতিষ্ঠিত আমাদের বেতারকেন্দ্র থেকে—গোপন কোডে।

মার্কস্ বলেছেন—"রাজনৈতিক বিরোধিতা ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এক সঙ্গে চলে না।" সেটা আমি ভালভাবেই জানতাম। কিন্তু যদি সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে এই পন্থা অবলম্বন করে অলোকবাবুকে বাঁচানো যায় তাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি কী? তাছাড়া অলোকবাবুর মতো একজন লোককে যদি আমরা সমর্থক হিসেবে পাই—আন্দোলনেরও সুবিধা হবে। আমি পার্টির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য আমি কোন দিনও ব্যাকুল হ'ব না। তবুও মনটা কেন যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে বলা যায় না। এক এক সময় মনে হয় মায়ের কাছে চলে যাই। কিন্তু তা হয় না। হতে পারে না। কারণ আমি মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত।

দীপালিকে আমি বহুদিন দেখিনি। সেই কবে শেষ দেখেছিলাম বিয়ের রাতে। খবরের কাগজে ওর ফটো দেখে প্রথম জীবনের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন বোধ হয় নবম শ্রেণীতে পড়ি। ভালবাসা-টালবাসা কাকে বলে জানি না। তবে—কি একটা আকর্ষণ জন্মেছিল ওর উপর। একবার ওর খুব অসুখ করেছিল। প্রায় পনের দিন স্কুল যেতে পারেনি। আমি ক্লাসে যেতাম কিন্তু ক্লাসে করতে ইচ্ছে করত না। সব সময় ওর বসা জায়গাটার দিকে তাকাতাম। ভিতরটা ছট্‌ফট্ করে উঠত। ওর বাড়িতে গিয়ে যে খবর নেব সে সাহসও ছিল না। কারণ ওকে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে বেশ কয়েকটা গুজব রটে গিয়েছিল স্কুলে ও গ্রামে। যেদিন দীপালি স্কুলে এল সেদিন যে কি আনন্দ হয়েছিল তা, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দীপালিরও যে একটা আকর্ষণ আমার প্রতি ছিল তা,

প্রকাশ পেত ওর চোখ ও মুখে। কিন্তু কেউ কাকেও কোন দিন প্রেম নিবেদন করিনি বা আমি তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি একথা বলিনি। যখন ওর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে তখন দীপালি চিঠি দিয়েছিল আমাকে। চিঠি পড়ে মানে বুঝতে পারলেও কিছু উপায় করতে পারিনি। উপায় করা সম্ভবও ছিল না। হয়ত ভালই হয়েছিল। বিয়ের রাতে ও খুব কেঁদেছিল। শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় সেই কান্নাভরা দৃষ্টি আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না। তারপর আর আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। যখন এই সব কথাগুলো চিন্তা করছিলাম তখন অলোকবাবু পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—ইউ-রাস্‌কেল—আমাকে ছেড়ে দাও, না হয় আমাকে শেষ করে ফেলো।

ধীরে ধীরে আলোকবাবুর কাছে গিয়ে বললাম—অলোকবাবু আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? অলোকবাবু 'ষ্টুপিড'-বলে ঘাড় ঘুরিয়ে নিলেন। তবুও আমি বললাম—অলোকবাবু, আপনাকে মেরে ফেলবার জন্যে আমরা এখানে আনিনি। আপনাকে ছেড়েই দেব। তবে কয়েকটা শর্ত আপনাকে মানতে হবে।

অলোকবাবু বাঘের মতো গর্জে উঠে বললেন—ইডিয়েট, রাস্কেল, কোন শর্ত আমি মানতে রাজি নই। কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কুঞ্চন লক্ষ্য করা গেল। বুঝতে পারলাম অপারেশনের জন্যে ব্যথা বোধ করছেন। একটা ট্যাবলেট এনে খাইয়ে দিয়ে বললাম এখন ঘুমিয়ে পড়ুন। সেরে উঠুন, পরে কথা হবে।

একদিন দু'দিন করে সাতদিন কেটে গেল। পেপারও আসছে না। রজতদার কাছে যাকে পাঠিয়ে ছিলাম সেও ফিরে আসেনি। ম্যাসেজ করেছিলাম ভূপেনদাকে। ভূপেনদা বলেছিলেন কড়া অবরোধ, চিন্তা নাই, পরিস্থিতির জন্য সজাগ আছি। কিন্তু কেউ না আসায় মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। চিন্তাও হতে লাগল। এতগুলো লোকের খাবার-দাবার। অলোকবাবুর মেডিসিন। কি করে পৌঁছবে এখানে? মাঝে মাঝে দেখতে পাই জেট বিমানগুলো মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে

ভীষণ গর্জন করে। এখানের জঙ্গল এত ঘন যে সূর্যের আলোও প্রবেশ করে খুব কম। তার উপর আমাদের দুর্গকে এমন কৌশলে গাছের ডাল পালা নুইয়ে আচ্ছাদিত করা হয়েছে যে, বাহির থেকে মাইক্রোস্কোপ দিয়েও বুঝা যাবে না এখানে মানুষের ঘাঁটি আছে। তবুও আমি মুক্তি ফৌজদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম বিমান আক্রমণের জন্য।

অলোকবাবুর ক্ষতে একটু ঘা দেখা দিয়েছে। বিশেষ একটা এ্যান্টিব্যায়োটিক মেডিসিনের প্রয়োজন। মেডিসিন না দিতে পারলে যদি ক্ষতের ঘা বেড়ে যায়, অলোকবাবুকে বাঁচানো যাবে না। শিবিরের ডাক্তার গতকাল একথা বলেছেন। তাই চিন্তা হতে লাগলো কিভাবে ওষুধ পাওয়া যাবে। শহরে না যেতে পারলে ওষুধ তো পাওয়া যাবে না। এই ক-দিনে একজন লোকও আমাদের শিবিরে আসছে না। এতেই বুঝা যাচ্ছে অবরোধ খুব জোরদার।

সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে দিলাম ভূপেনদা ও শশাঙ্কদাকে। আর, একজন বেশ বিশ্বস্ত ও চালাক চতুর ফৌজকে ট্রেনিং দেওয়া হতে লাগলো অবরোধ এড়িয়ে শহরে যাওয়ার জন্যে। লাল গেরুয়া কাপড় পরানো হল। একটা ঝুলি করা হল। ঝুলিতে বিভিন্ন শিকড়-বাকড় দেওয়া হল। হাতে দেওয়া হল একটা চিমটে ও লাঠি। কমণ্ডলু পাওয়া গেল না। বেশ কয়েকটা সংস্কৃত শ্লোকও শিখিয়ে দেওয়া হল মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্যে যাতে সকলেই ভাবে সে একজন সাধু বা কাপালিক।

সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে ভালভাবে ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সন্ধ্যের পূর্বেই ফিরে আসার কথা। কিন্তু ন'টা বাজল তবুও ফিরে এল না। ফৌজদের ট্রেনিং চলছে জোর কদমে। লাঠি চালানো, বন্দুক ছোড়া, বর্শাছোড়া, ভোজালি চালানো, বোমা মারা, ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। শিবিরে যা খাবার আছে তাতে বড় জোর আট দশ দিন চলবে। এক একটা দিন যায় মনটা দুর্বল হয়ে পড়ে। বনের ফলমূল খেয়ে এতগুলো লোকের ক'দিন চলতে পারে? এখানকার

সংগঠনের যাকে পাঠানো হয়েছিল রজতদার কাছে সে যদি ধরা পড়ে, গোপন খবর মেরে ফেললেও প্রকাশ করবে না জানি, কিন্তু রজতদার কাছে পৌঁছল কিনা সে খবরই বা পাই কি করে? কখনও মনে হচ্ছে আসার সময় ধরা পড়েছে আবার কখনও মনে হচ্ছে যাবার সময় ধরা পড়েছে।

ট্রেনিং শেষে সকলকে জড়ো করে মিটিং ডাকলাম। রাত তখন প্রায় বারোটা। উদ্দেশ্য বনের চারধারে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দেখা অবরোধ কিভাবে ভাঙা যায়, আর তাদের মনোবল যাচাই। এখানকার অধিকাংশ মুক্তি ফৌজই আদিবাসী। সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, লোধা আর কিছু সামান্য মধ্যবিত্ত সাধারণ লোক। এক একজন মুক্তি-যোদ্ধা কম করেও পাঁচজন পুলিশ বা সি. আর. পি.-র মহড়া নিতে পারবে।

অলোকবাবুর শরীরের ক্ষত স্থানের ঘা বেড়ে যাচ্ছে। যদি ঠিক মতো ওষুধ না দেওয়া যায় হয়ত বাঁচবেন না। এমতাবস্থায় কি করি চিন্তা করতে পারছি না। মেয়েছেলের ছদ্মবেশে যে যাব তারও উপায় নেই। কারণ আমার বয়স অল্প। সি. আর. পি.-দের সন্দেহ হবেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে করেই হোক আমাকে শহরে যেতেই হবে এবং ওষুধ আনতেই হবে। ঠিক করলাম সি. আর. পির ছদ্মবেশে যাওয়াই ভাল।

সি. আর. পি.র ড্রেস পরেছি, কাঁধে রাইফেল, সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত, সাহসী ও শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধা। হঠাৎ যদি আক্রান্ত হই লড়তে পারা যায় যেন কিছুক্ষণ। সঙ্গীর সাথে ছিল কয়েকটা বোমা। যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারি। ভোরের বেলা একটু ঘুম বেশী হয় পাহারাদারদের। তাই ঐ সময়টাই ঠিক করেছিলাম। যাকে সাথে নিয়েছিলাম তার ঝাড়গ্রামের পথ-ঘাট সব চেনা। সে এই অঞ্চলেরই লোক।

মা ও মাতৃভূমিকে প্রণাম করে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছলাম

তখনও সামান্য অন্ধকার। দেখলাম, সত্যিই অবরোধ কত কড়া। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছিলাম সে পথটা শহরের লাগালাগি। এ পথে সাধারণতঃ বিপ্লবীরা আসবে না—এ ধারণাটাই স্বাভাবিক। তবুও দেখলাম আট দশ গজ অন্তর-অন্তর এক একজন সি. আর. পি.। অবশ্য ঘটনাটাও সামান্য নয়। এস. ডি. পি. ও. অপহৃত। আমাদের দেখেই একজন বলে উঠল—কৌন হ্যায়। আমি বললাম—'প্রীতম সিং হ্যায়'।

প্রীতম শব্দটা এমন ভাবে উচ্চারণ করলাম—যাতে বুঝতে না পারে। কারণ নামটা ভালভাবে বুঝতে পারলে বিপদ। যা হোক লোকটা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতে বুঝতে পারলাম লোকটা ঘাড় বাঁকিয়ে আবার ঘুমোতে লাগল। ভয়ের জন্যে বুকটা টিপটিপ করছিল। তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলাম। মিনিট দুই-এর মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেলাম। সঙ্গীও খুব এক্সপার্ট ও বুদ্ধিমান ছিল। সে বলল—দাদা, এত সকাল তো দোকানপাঠ খুলবে না, তাই এত সকাল শহরে ঢোকা নিরাপদ নয়। আমি বললাম—তাই তো!

দু'জনে একটা বড় পুকুরের ধারে গেলাম। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে একটা গাছের তলায় রেখে বাবলা কাঠি ভেঙে দাঁতন ও প্রাতঃকৃত্য সারলাম। এখানেই প্রায় একঘণ্টা কেটে গেল। লোকজন পথে নামতে আরম্ভ করেছে। জঙ্গলের কাছেই শহর। কয়েকটা আদিবাসী মেয়ে বোধহয় জঙ্গলে কাঠি কাঠ ( গুল্ম জাতীয় কাঠের কাণ্ড ) সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল। তাদের সখেদ উক্তি, 'বনের মধ্যে যা পুলিশ, কাঠ আনতে যাওয়াই বিপদ। তবুও না গেলে নয়। দু-দিন হল হাঁড়ি চড়েনি'।

বলা বাহুল্য এখানের মেয়েরা বনে কাঠ সংগ্রহ করে এনে বাজারের দোকানে ও গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে বিক্রী করে! বিনিময়ে পণ প্রতি নগদে বারো আনা অথবা তৎ-বিনিময়ে দরা ( খুদ ) পায়। এই দরা এরা সেদ্ধ করে খায়।

মুখ হাত ধুয়ে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। টেবিলের উপর কাগজ পড়েছিল। কাগজ পড়ে বুঝতে পারলাম পূর্বপ্রেরিত মুক্তিযোদ্ধাটি হাজতে। চা খেয়ে যখন রাস্তায় নামলাম তখন মোটামুটি দোকান-পাট খুলতে আরম্ভ করেছে। দুজনেরই কাঁধে রাইফেল, সি. আর. পির ড্রেস, দেখে কেউ বুঝতে পারবে না আমরা অন্য কোন লোক। একটা দোকান থেকে ওষুধ কিনলাম। ওষুধ বেশী করেই নিয়ে নিলাম। যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলেও এ রকম বিপদে পড়তে না হয়।

কিন্তু মুশকিল হল এখন যাব কোথায়? পুনরায় ঘাঁটিতে ফিরে যাব তারও উপায় নেই। যাবার সব পথই বন্ধ। কড়া অবরোধ। রজতদার কাছে যাওয়াও ঠিক হবে না। কারণ এই ড্রেসে দিনের আলোয় তার কাছে গেলে তার ক্ষতি হবে। সকলেই অন্য রকম সন্দেহ করবে। তাছাড়া এও ভাবতে পারে রজতদা বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রাখে। কি করা যায়? সারাদিন তো রাস্তায় ঘুরা যায় না। তাতে বিপদও আছে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। অলোকবাবুর বাড়িতে গেলে কেমন হয়? অলোকবাবুর বাড়ির ঠিকানা জানা ছিল। দিপালীও খবর পাবে। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। কারণ তিনি একজন পুলিশ অফিসার। পুলিশ অফিসারের বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে এতো সাধারণ কথা। সঙ্গীর সাথে যুক্তি করে পায়ে পায়ে অলোকবাবুর কোয়ার্টারের দিকে এগোতে লাগলাম।

অলোকবাবুর কোয়ার্টারের কাছে যখন পৌছলাম বেলা তখন প্রায় সাতটা। সঙ্গী পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সে ছিল ঝাড়গ্রাম শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের বাসিন্দা। পথঘাট চিনত। এস. ডি. পি. ও-র কোয়ার্টারে পৌছতে আমাদের কোন অসুবিধে হলো না। একতলা কোয়ার্টারের সামনের দিকটায় একটি সুন্দর সাজানো বড় ফুলের বাগান। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাগানের ঠিক মাঝামাঝি মোরাম বিছানো সুন্দর একটি রাস্তা চলে গেছে একেবারে এস. ডি. পি. ও-র কোয়ার্টার অবধি। গেটে কোন তালা ছিল না। একজন

রাইফেলধারী গার্ড ছিল। আমার সি. আর. পির ড্রেসটি ছিল একটি ঊর্দ্ধতন অফিসারের। গেটের কাছে যেতেই বন্দুকধারী গার্ড অফিসার ভেবে সেলাম ঠুকে গেট সরিয়ে দিল। আমি আগে আগে চললাম। সঙ্গী আমাকে অনুসরণ করতে লাগল। বাগানের মাঝের সরু রাস্তাটির দুধারে রাখা ফুলের টবে ডালিয়া, জিনিয়া, কসমস প্রভৃতি বাহারি ফুলের গাছগুলির প্রত্যেকটিতেই ফুল ফুটেছিল। ফুলের মধু সংগ্রহকারি কীট-পতঙ্গ, মৌমাছিগুলি উড়তে লাগল। আমি চিরদিনই ফুল ভালবাসি। দিপালীও ফুল ভালবাসতো। ফুলের সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। ফুল কে-না ভালবাসে! যে শিশু ও ফুল ভালবাসে না সে নাকি শুনেছি ক্রিমিনাল হয়।

যখন স্কুলে পড়তাম তখন একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। আমি রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি আবৃত্তি করেছিলাম। সেই থেকে আমার নাম হয়ে যায় কৃষ্ণ। আমার গায়ের রঙও শ্যামবর্ণ। দিপালীর গায়ের রং ফিট ফর্সা। তাই বন্ধুরা প্রায়ই দিপালীকে রাধা, আমাকে কৃষ্ণ বলে রাগাতো।

দিপালী খোঁপা করে চুল বাঁধতো। তাতে ফুল গুঁজতো। সেই ফুল বাড়ি ফেরার সময় আমাকে দিত। কৈশোরের সুন্দর দিনগুলি স্মৃতিতে ভাসতে লাগলো। তখন বয়সের জন্যই মনে হয় জীবন-বোধ কম ছিল। রোমান্সে মন আচ্ছন্ন থাকতো। আজ জীবন বড় বাস্তব ধর্মী। এধার ওধার হলেই বাঁচার লড়াই-এ পিছু হটতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ যেমন দিন দিন পিছু হঠছে। বিশ্বব্যাংকের টাকা কোন কিছুতেই উন্নতি সাধন করতে পারছে না। কু-সংস্কারও এর মূলে অনেকটা দায়ী বলা যেতে পারে। তবে মূল জিনিষ শিক্ষা। আজ আমাদের দেশে যেটির সব চেয়ে বড় অভাব তা হলো শিক্ষা।

বাড়ির দরজায় কড়া লাড়লাম। একটি পনেরো ষোল বছরের যুবতী বেঁটে শ্যামলা মেয়ে দরজা খুলে দিল এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা

ভাষায় জিজ্ঞেস করল—কাকে চাই? আমিও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললাম—'ম্যায় পুলিশ অফিসার, মেমসাব কা সাথ মুলাকাত চাইয়ে। মেয়েটি দেখলাম আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কোন কথা না বলে মুখের দিকে তার চাওয়ার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি বুঝে নিলাম সে আমার কথা বুঝতে পারছে না। তাই আবার বাংলায় হাত নেড়ে ও অঙ্গ-ভঙ্গি করে বললাম—মেমসাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। এদিকে দিপালী বোধহয় বাড়িতে কেউ আসছে বুঝতে পেরেছিল। ঘর থেকে নিচু গলায় বললো— মমি ওনাদের বসতে বল। আমি যাচ্ছি।

সেই গলা। অনেক দিনের অনেক কালের পরিচিত। হার্ট নামে আমাদের বুকের মধ্যে যে যন্ত্রটা আছে সেটার স্পন্দন যেন বেড়ে গেল। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্র নাথের স্বপ্ন কবিতার সেই লাইন কটা —'মোরে হেরি প্রিয়া/ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া/আইল সম্মুখে, মোর হস্তে হস্ত রাখি/নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি 'হে বন্ধু আছ তো ভালো?'

—কিন্তু-রে মুর্খ, তুই যে বিপ্লবী। প্রেম-ভালবাসা তোর কাছে যে সোনার পাথর বাটি।

মেয়েটি আমাদের নিয়ে গিয়ে-গেস্টরুমে বসালো। সুন্দর ছিমছাম ঘরটি। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজী, সুকান্ত থেকে আরম্ভ করে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও টাঙানো রয়েছে ঘরে। প্রশস্ত টেবিলটার চারধারে ছ-খানি চেয়ার। ফুলদানি, এ্যাসট্রে। দিপালী মফঃস্বলের মেয়ে হলেও রুচিহীনা ছিল না। বিয়ের পর উন্নত পরিবেশে জীবন ধারণের মান মফঃস্বল ছাড়িয়ে শহরের বর্তমান সভ্যতার কোলে যে আছড়ে পড়েছে তা সুন্দরভাবে বোঝা গেল। দিপালীর ছেলেটিকে খবরের কাগজে দেখেছিলাম, ছেলেটিকে দেখারও কেমন যেন একটা ইচ্ছে হচ্ছিল।

যদিও জানি কোন ভয় নেই তবুও আগে থেকে সতর্ক হওয়া ভাল। তাই পকেটের রিভলবারটা ঠিক করে রাখলাম। কারণ

মানুষের মন, কখন কি হয়। দিপালী হয়ত হঠাৎ আমাকে চিনতে পেরে আনন্দে অথবা ঘৃণায় চেঁচিয়ে উঠতে পারে। তাহলে সর্বনাশ হবে। অবশ্য না চেনাটাই স্বাভাবিক। কারন দীর্ঘদিন কারও সাথে কারও দেখা নেই। উপরন্তু আমি সি. আর. পি-র অফিসারের ড্রেস পরে আছি। মুখে বহুদিন না কামানো দাঁড়ি-গোঁফ। তবুও গালে চৌকো আকারে কাটা দাগটার জন্য ভয় হচ্ছিল।

মিনিট তুয়েকের মধ্যে দিপালী এসে হাজির হলো। পরণে সুন্দর একটা সুতীর ছাপা শাড়ি। সিঁথিতে ও কপালে গোধুলির রক্তিমাভার মতো লাল ডগডগে সিঁতুর। স্বাস্থ্যটা একটু ইম্প্রুভ করেছে। রঙটা যেন আরও একটু ফর্সা হয়েছে। তবে মনে যে একটা অশান্তি চলছে তা দেখলেই বোঝা যায়। চিরদিনের সেই আজানুলম্বিত কালো চুল, যার জন্যে তাকে, স্কুলে আমাদের ক্লাশের বাণী, মণি, রূপা, চৈতালী সকলেই হিংসা করতো। আমি মাঝে মাঝে তামাসা করে বলতাম—তোকে কেন যে কেয়ো-কার্পিনের মালিক মডেল গার্ল হিসেবে বিজ্ঞাপনের জন্য ডাকছেনি জানিনা। আমার কথায় ও কোনদিন রাগ করতো না। বরং মনে যে আনন্দই পেত, তা ওর মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যেত।

দিপালী এসেই নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলো—কি প্রয়োজন বলুন, আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন? আমি যতদূর সম্ভব গলার স্বর নকল করে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললাম—না মেদিনীপুর সদর থেকে আসছি, আপনার কয়েকটা ভারশন্ নোট করতে চাই যা আমাদের তদন্তের কাজে লাগবে। দিপালী বললো—ক্যাইগুলি একটু বসুন—চা খান। আমি বাচ্চাটাকে আয়াটার কাছে দিয়ে আসছি।

দিপালী চলে গেল। এতক্ষন আমার সঙ্গীটি একদৃষ্টিতে দিপালীর দিকে চেয়েছিল। সে হয়তো ভাবছিল—এ কি মানবী না কোন অপ্সরা। কারণ দিপালী যে রকম দেখতে সুন্দর, তাতে একজন আদি-বাসীর মনে এরকম ধারণা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। মিনিট তুয়েক অপেক্ষা করতেই শ্যামবর্ণা যুবতী আয়াটি চা নিয়ে এল ট্রেতে

করে। সঙ্গে বিস্কুট। পাশের ঘরে বাচ্চাটির মৃদু কান্নার স্বর শোনা যাচ্ছিল। যুবতী আয়াটি চা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি দুটো বিস্কুট আর চা সঙ্গীকে দিয়ে নিজেও বাকী দুটো বিস্কুট আর চা নিয়ে খেতে লাগলাম। ইতিমধ্যে দিপালীও বাচ্চাটিকে আয়ার তত্বাবধানে রেখে সামান্য সাজগোজ করে আমাদের কাছে এসে আমার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে। তার কোন কৌতূহলই আমি টের পেলাম না। সাধারণ একজন পুলিশ অফিসার হিসেবেই যে আমাকে ট্রিট করছে তা বুঝতে পারলাম।

ঠিক চা খেয়ে কাপটি টেবিলের উপর নামিয়েছি হঠাৎ একটা গাড়ীর শব্দ শুনতে পেলাম। জানালাটা খোলা ছিল। জানালা দিয়ে বাগান পেরিয়ে পথটা দেখা যায়। দেখলাম একজন সাদা পোষাকের পুলিশ অফিসার আর দু'জন সাধারণ খাঁকি ড্রেস পরা পুলিশ গাড়ি থেকে নামছে। আমি চটপট রিভলবারটা পকেট থেকে বের করে ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে দিপালীর মুখ চেপে ধরলাম এবং তাড়াতাড়ি জানালার পাশে আড়ালে টেনে নিয়ে গেলাম। দিপালী এই অতর্কিত আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি মন্ত্র পড়ার মতো চটপট আমার পরিচয় দিয়ে বললাম—অলোকবাবু আমাদের শিবিরে বন্দী আছেন। তাকে যদি বাঁচাতে চাও এবং নিজে যদি বাঁচতে চাও তাহলে আমরা তোমার আত্মীয় বলে ঐ পুলিশ অফিসারের কাছে পরিচয় দিও। আরও বললাম—অলোকবাবুর বডিতে সেপটিক্ হয়ে গেছে। মেডিসিন কেনবার জন্য প্রাণের রিস্ক নিয়ে পার্টির নির্দেশে এসেছি। অতএব বুঝতেই পারছো তোমার এখন কি করা কর্তব্য? দিপালী ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমি বললাম—ভয়ের কোন কারণ নেই। সঙ্গীকে ইঙ্গিতে ড্রেস খুলতে বললাম। দিপালীকে ছেড়ে দিলাম। তীক্ষ্ণধী দিপালীও দেখলাম নিজেকে সামলে নিল তাড়াতাড়ি। নিজেই এগিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল। জানালাটাও বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল—চটপট ড্রেসগুলো

খুলে ফেলো। আমি জামাকাপড় এনে দিচ্ছি। বড় জোর এক কি দেড় মিনিট লাগল দিপালীর জামাকাপড় নিয়ে আসতে। আদিবাসী সঙ্গীটিকে ট্রাউজার আর গেঞ্জি পরতে দিয়ে বললাম—তুমি বাড়ির গৃহভৃত্যের মতো ব্যবহার করবে। অলোকবাবু চশমা পরতো জানতাম। আমি দিপালীকে বললাম—অলোকবাবুর একটা চশমা অথবা গগলস্ নিয়ে এসো। চশমা কিংবা গগলস্ পরলে ফেসকাটিং কিছুটা অন্য-রকম দেখায় তা আমি জানতাম।

আমরা যখন ড্রেস পরছি। দরজায় বারবার কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল, দিপালী সাধারণ গলায় বললো—একটু দাঁড়ান যাচ্ছি। আমাদের ড্রেসগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দিপালী।

ঘরের কোনে একটা ঘরঝাড়া লম্বা ঝাড়ন ছিল। ঝাড়নটাতে চোখ পড়া মাত্র মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি সঙ্গীটিকে বললাম—তুমি ঘড় ঝাড়তে লেগে যাও। সঙ্গীও লক্ষী ছেলের মতো ঝাড়নটি নিয়ে ঘর ঝাড়তে আরম্ভ করে দিল। আমি আলমারি থেকে চটপট একটা বই টেনে নিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে চশমাটা পরে বই এর পাতায় মনোনিবেশ করলাম।

উপস্থিত বুদ্ধি বিপ্লবীদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। বহুরূপীর মতো তাদের বারবার ভিন্ন-ভিন্ন রূপ অবলম্বন করতে হয়। তা না হ'লে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

কোলে ফুটফুটে বাচ্চা। রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখ দেখলে মনে হবে নিশ্চয় কোন আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে। দিপালী গিয়ে দরজা খুলে দিল। আমি ঘাড়টা একটু হেলিয়ে বাচ্চাটা ও আগন্তুক পুলিশ তিন জনকে দেখে নিলাম।

বাচ্চাটির গড়ন, রঙ আর চুল মনে প্রাণে অতিনিষ্ঠুর কয়েদির মনকেও নাড়া দিবে। এই সব বাচ্চাদের জন্ম থেকে কোন ভিটামিনের অভাব হয়না। অথচ এই রকম, মায়ের কোলে অনেক বাচ্চাকে আমি গ্রামে গ্রামে সংগঠণের কাজ করার সময় দেখেছি। তাদের

অপুষ্টিজনিত চেহারা দেখলে চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসবে। পেট-পুরে মায়ের বুকের দুধটুকুও তারা হয় তো খেতে পায়নি। নমস্কার ম্যাডাম্—পুলিশ অফিসারটি হাত তুলে দিপালীকে নমস্কার ক'রলো।

দিপালীও প্রতি নমস্কার জানালো। পুলিশ অফিসারটি বললেন—আমরা মেদিনীপুর সদর থেকে আসছি, আমি ডি. এস. পি. সুখময় দাস। অলোকবাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানতে চাই। যদিও ইতিপূর্বে আমি স্পেশাল আই. বি. মারফত সব রিপোর্ট পেয়েছি। কলিকাতাতে পুলিশ কমিশনারকে সব রিপোর্ট পাঠিয়েও দিয়েছি। তবুও কয়েকটি ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। অনুগ্রহ করে কিছুটা সময় দিলে খুব উপকৃত হ'ব।

দিপালী সবিনয়ে ব'লল—থ্যাঙ্ক ইউ। আপনারা বসুন। আমি বাচ্চাটা আয়ার কাছে দিয়ে আসি। এই বলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল—সেজদা, তুমি একটু ঘরের ভিতরে গিয়ে বসো, আর হ্যাঁ—সরেন, তুমি ভিতরের ঘরের ফ্যানটা ততক্ষণ পরিষ্কার করে দাও। ঝাড়াঝাড়ি করবে পরে। দিপালী বলা মাত্র আমি উঠে দাড়ালাম। সঙ্গীও ঝাড়ন রেখে দিয়ে আমার পিছু পিছু অনুসরণ করলো।

দিপালী যেভাবে কৌশলে সমস্ত ম্যানেজ ক'রল, তা সাধারণ মেয়ের পক্ষে খুবই অসম্ভব।

আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ অফিসার তার কাজ শেষ করে চলে গেলেন। আমরা ঘরে থাকাকালীন চা এল, বুঝতে পারলাম সাধারণ কাট্সির জন্য আমাদেরও চা পাঠিয়ে দিয়েছে। যুবতী আয়াটি বারবার বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে দেখছিল। সেও কিছুটা ভড়কে গেছে বুঝতে পারলাম।

দিপালীর ব্যবহারে আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হতে লাগল। স্বামীর জন্যই হোক আর যে কারণেই হোক বড় ধরণের একটা বিপদ অতিক্রম করলাম। সত্যিই নারীদের চরিত্র বড় বিচিত্র। পুরাণ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত যুগে যুগে নারী মহীয়সী।

আধুনিক সভ্যতার মারপ্যাচে কত বদনাম, কত অপবাদ আমরা নারী জাতিকে দিচ্ছি। নারীকে কিছু স্বার্থান্বেষী আজ করে তুলেছে ভোগ্য পণ্যের মতো। এটা কি নারী জাতির দোষ না আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থার দোষ? ঝুমুর, বিভা, ফুলমতিয়া, শ্যামলীর দিকে চেয়ে দেখলে হয়তো কিছু শিক্ষা আমাদের হোলেও হতে পারে।

বেলা বেড়ে দশটার কাঁটা অতিক্রম করলো। দিপালী ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। রুক্ষ, আজানুলম্বিত খোলা চুল। কয়েক দিন ভাবনা চিন্তায় চোখের কোনে কালি পড়েছে।

দিপালী ঘরে ঢুকে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি কি বলবো কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। সঙ্গীকে গেষ্টরুমে গিয়ে বসতে ব'ললাম। সঙ্গীটি উঠে গেলে দিপালীকে ব'ললাম—আজ তুমি যা করলে তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, তারপর বলো তোমার ছেলের কি নাম রেখেছ?

দিপালী মৃদু গলায় বললো—রঞ্জন।

রঞ্জনকে আদর করে দিপালীর কোল থেকে নিয়ে চুমু খেলাম। দিপালীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম চোখের কোনে জল।

আমি বললাম—ভয়ের বা চিন্তার কোন কারণ নেই। ভাল ডাক্তার ট্রিটমেণ্ট করছেন। আজ রাত বা কাল থেকেই এ্যান্টিবায়োটিক পড়ে যাবে। টিটেনাসের কোন ভয় নেই। আমি থাকতে অলোকবাবুকে মরতে দেবনা সহজে। তবে অলোকবাবু যাতে আমাদের সেক্রেসি আউট না করেন, এবং আমাদের হ'য়ে কিছু কাজ করেন তার জন্য উনাকে তুমি একটা চিঠি লিখে দাও। আর আজ সন্ধে পর্যন্ত একটু আশ্রয় দাও আমাদের।

দিপালী ব'লল—অভিদা—এ তুমি কোন পথ ধরলে শেষ পর্যন্ত। তোমার মতো বুদ্ধিমান ছাত্র কলেজে পড়তে গিয়ে···।

মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে ব'ললাম—

কেন কি আবার খারাপ করলাম? মায়ের সেবা করছি, মাতৃ-

ভূমির লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি শোষিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করছি। তুমি দেখেনিও জয় একদিন আমাদের হবেই হবে। দিপালী বললো—তর্কে ও কথায় তোমাকে আমি কোনদিন হারাতে পারিনি আর তোমার সাথে আমি তর্কও করতে চাই না। তবে নিজের কথা, তোমার মায়ের কথা একবার চিন্তা করেছ?"

আমি বললাম—ও-সব কথা ভাববার সময় কোথায়। তাছাড়া এক মায়ের জন্যে তো লক্ষ লক্ষ মাকে আমি বঞ্চিত করতে পারি না। তোমাদের জীবন আর আমাদের জীবন আলাদা আলাদা। তোমাদের গাড়ী, বাড়ি, ফ্রিজ, টি. ভি., ভোগ বিলাস—এটাই জীবন। তোমরা যাদের বুকের রক্তে, যাদের মাথার ঘামে জীবন খুঁজে পাও, তাদের জন্যই আমাদের সংগ্রাম। শোষণহীন সমাজ গড়ার চেষ্টা। আচ্ছা বলতো, তোমার বাড়ীতে ঐ যে যুবতী মেয়েটি আছে ওর কি ইচ্ছে করে না তোমাদের মতো করে বাঁচতে, তোমাদের মতো বিছানায় শুতে? গাড়িতে চেপে বেড়াতে? হয়তো চড়ে—চড়াও বলে। ও কিন্তু ইচ্ছে করলেই তোমাদের সরকারী গাড়ীর ড্রাইভারকে বলতে পারে না—চলুন তো একটু আমাকে ঘুরিয়ে আনবেন এই সন্ধ্যার নির্জনতায় ঝর্ণার পাশ থেকে। তোমরা স্বাধীন ও কিন্তু স্বাধীন নয়। তোমরা শ্রম করোনা, ও কিন্তু শ্রম করে। কিন্তু প্রকৃত মূল্য পায়না। ও আজই ইচ্ছে করলে ছোট্ট একটা সংসার গড়তে পারে না। আর সংসার করলেও শান্তি পাবে না। কারণ ওরা যে অভাব নামক ভীষণ সাংঘাতিক একটা অবস্থার শিকার। তোমরা এবং তোমাদের মত শ্রেণীর লোকেরা আজ কত্তো সুখী। তোমাদের খাওয়া, দাওয়া, থাকার কোন চিন্তা করতে হয় না। অথচ দেখ দিনরাত খেটে একজন প্রান্তিক চাষী বা একজন শ্রমিক শুধু পেটের দুটো ভাত জোগাড় করতে পারে না। তাদের যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানের না আছে শিক্ষার কোন গ্যারান্টি, না আছে প্রতিষ্ঠার কোন পথ। মাত্র কিছু সংখ্যক লোক (সংখ্যায় যারা মাত্র ১৪-১৫ শতাংশ) আজ গোটা দেশকে শোষণ

করে চলেছে। বিলেতে ব্যাংক ব্যালেন্স, সম্পত্তি পর্যন্ত করেছে স্বনামে ও বেনামে। এ এক প্রহসন। এর শিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। একটু বাইরের দিকে তাকাও। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, রাশিয়ার মানুষ আজ কতো সুখী। যদি বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে আজ আমাদের দেশের লোক বুঝতে পারে তাহলে আর আমাদের কোন অভাব থাকবে না।

আমাদের যুদ্ধ—শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তদের সাথে জোতদার পুঁজি-পতি নামক বুর্জোয়াদের। আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এমন সংকটের সম্মুখীন যে ছাঁটাই, লে অফ, ক্লোজার প্রভৃতির মাধ্যমে বহু শ্রমিক আজ ভিখিরি। ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত্র মজুরের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বেকার যুবকরা দিশেহারা, কর্মসংস্থানের কোন সুষ্ঠু কর্মসূচী তাদের সামনে নেই। এমতাবস্থায় দেশে যদি জন-জাগরণ অর্থাৎ বিপ্লব না হয় তবে দেশকে অর্থনৈতিক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হবে। বিদেশীরা সেই সুযোগে দেশটাকে আবার উপনিবেশ বানাবার চেষ্টা করবে। আবার আমরা হবো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে পরাধীন। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। একটি দেশ কতটা উন্নত এবং স্বাধীন তা মাপা হয় তার অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার মাপকাঠিতে। বাইরের রাষ্ট্রের অনুগ্রহে, দানে, ঋণে আজ আমরা নামেই স্বাধীন। বাইরের রাষ্ট্রের কাছে আমাদের দেশের ঋণের বোঝা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। পরোক্ষ ভাবে সেই বোঝা বইতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এর ফল সুদূর প্রসারী। এর ফল ভোগ করবে তোমার এই বাচ্চা ছেলেটা নয়ত তার জেনারেশন্। অথচ বলতো—কি নেই আমাদের, প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের দেশ অনান্য দেশের চেয়েও সমৃদ্ধ। শুধু স্বার্থান্বেষী পুঁজি-পতিরা অর্থনীতিকে কব্জা করে রেখে দেশে কোটি কোটি জনগণকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

দিপালী খুবই বিচলিত বোধ করছিল। প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম—

খুব খিদে পেয়েছে কিছু খাওয়াতে পারো? দিপালী বললো—বসো তোমার জন্য মুড়ি আনছি।

আমিও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ঘরের ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে বেডের উপরে শুয়ে পড়লাম।

একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। দিপালীর ডাকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলাম। গতকালের টেনশান্ ও রাত্রি জাগরনে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দেখলাম দিপালী থালায় করে তেল ভেজে পেঁয়াজ কুচিয়ে মুড়ি নিয়ে এসেছে। একটা নয় তু'টি থালাতে। আমার সঙ্গীকে একটি থালা দিয়ে আমি একটি থালা নিয়ে খেতে লাগলাম। আমি তেল লংকা ভাজা দিয়ে মুড়ি খেতে খুব ভালবাসতাম। দিপালী তা এখনও ভুলেনি বুঝতে পারলাম। যখন ওদের বাড়িতে ওর বাবার কাছে পড়তে যেতাম, তখন প্রতিদিনই দিপালী আমাকে মুড়ি খাওয়াতো।

আমি যখন মুড়ি খাচ্ছিলাম তখন দিপালী বললো—অভিদা তুমি আমার একটা কথা রাখবে? তোমার কাছে কোনদিনই কোনকিছু চাইনি। আজ একটা জিনিষ চাইব, দিবে?

আমি বললাম—কি—তোমার হ্যাজবাণ্ডের মুক্তি?

দিপালী বললো—না।

আমি বললাম—তবে কি বলো?

দিপালী বললো—প্লিজ তুমি এ লাইন ছেড়ে দাও। আমি অনেক আগেই শুনেছি তুমি নিষিদ্ধ পার্টিতে যোগদান করেছ। মাসীমাও বলেছিলেন যখন আমি দীঘল গাঁয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার জন্যই তোমার আজ এই অবস্থা। আমার যদি বিয়ে না হতো তাহলে কখনই তুমি এই লাইনে আসতে পারতে না।

আমি হেসে বললাম—তোমার ভুল ধারণা। তোমার সাথে বিয়ে হয়নি ভালই হয়েছে। হলে হয়তো আমাকে সংসারী হতে হতো, নয়তো তোমাকে অশেষ তুর্ভোগ পোয়াতে হতো। যা ঘটার তা ঠিকই

ঘটতো। তোমার ভালবাসা আমাকে জীবন সম্বন্ধে ভাবতে শিখিয়েছে ঠিকই, তবে সে ভাবনা শুধু ভোগ নয়, বৃহত্তর কিছু। তোমার বিয়ে আমার জীবনে আশীর্বাদ। দিপালী একটু অভিমান করে বললো— তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসনি। তখন তাহলে নিছকই খেলা করতে।

আমি বললাম—হয়ত তাই। ভালবাসা কি জিনিষ তখন না বুঝলেও এখন তা বুঝি। তাই—তোমাকে আগের চেয়েও ভালবাসি। ভালবাসি লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি আমার দেশের মা—বোনেদের। ভালবাসি নির্যাতিত প্রেমিক ও প্রেমিকাকে। যারা একটা ছোট্ট নীড়ের স্বপ্ন দেখে। অথচ সামান্য অর্থ নৈতিক স্বচ্ছলতা, একটা চাকরি নেই বলে ঘর বাঁধতে পারছেনা। দিপালী বললো—তাহলে তুমি আমার কথা রাখবে না? আমি বললাম—পারলাম না, ক্ষমা করো। তুমি বেশ বদলে গেছ তো? সেই দিনগুলোর কথা তুমি কি করে ভুলে গেলে বুঝতে পারছি না। অথচ অত কম বয়সেই তুমি কতো বড় বড় দেশাত্মবোধের কথা বলতে। বড় হয়ে নার্সিং পড়বে। লোকের সেবা করবে।

দিপালী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো—হলো আর কৈ, সবই তো গোলমাল হয়ে গেল।

আমি বললাম—কিছুই গোলমাল হয়নি। বরং খুবই ভাল হয়েছে। অনেক কিছুই করতে পারো এখন।

দিপালী বললো—কি ভাবে?

আমি বললাম—সরকারের গোপন রিপোর্ট আমাদের সাপ্লাই করে। অলোকবাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের ফরে এনে, আমাদের একটু হেল্প করো না?

দিপালী বললো—তা কি করে হয়। সে অফিসার। তার ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তি আছে। তাছাড়া সে সরকারী চাকুরে। সরকার মাইনে দেয়। সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

আমি বললাম—কে সরকার? কারা সরকার? ঐ বুর্জোয়া সরকারই তো ভোট নামক ভাঁওতা বাজির কল গড়েছে। আর ঐ কলেই সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ পেষাই হচ্ছে। তুমি নিশ্চয় জান, আজও আমাদের দেশে টাকা দিয়ে ভোট ও এম. এল. এ., এম পি কেনা বেচা হয়। তোমার মত শিক্ষিত মেয়ের মুখে এ রকম কথা মানায় না। আর বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা বলছো—সবচেয়ে বিশ্বাস-ঘাতক বলতে গেলে ঐ আমাদের দেশের নেতাগুলো। যারা নির্বাচনে শত শত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, একটিও রাখে না। যারা জনগণকে ঠকিয়ে জনগণের পয়সায় এয়ারকুলার গাড়িতে চড়ে, তারা বিশ্বাসঘাতক নয়?

দিপালী বললো—দেখ অভিদা তুমি যা বলছো, তা অবশ্যই রূঢ়-বাস্তব, সত্য। কিন্তু সব সত্যকে তো সব সময় মানুষ স্বীকার করতে পারে না। আর সব সত্যকে যদি মানুষ সব সময় স্বীকার করে নিত তাহলে একদিকে যেমন কিছু সুফল পাওয়া যেত, কুফলও কিন্তু কম পাওয়া যেত না।

কি রকম—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দিপালী বললো—ধরো তুমি আমাকে ভালোবাস, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখনও হয়তো তোমার প্রতি আমার টান ও দুর্বলতা আগের মতই আছে। হয়তো এখনও তোমাকে পেলে আমি সুখী হতে পারি। কিন্তু তবুও তো আমি সমস্ত কিছু ছেড়ে এখনই তোমার সাথে বেরিয়ে পড়তে পারি না। কারণ সমাজ আছে, আর সেই সমাজের জন্ম দিয়েছে মানুষ। ধরো, আজ যদি সাধারণ অজ্ঞলোক রাষ্ট্রভার হাতে পায়, তারা কি সুষ্ঠু ভাবে দেশ চালাতে পারবে?

আমি সামান্য হেসে বললাম—না, তা পারবে না। তবে তাদের প্রতিনিধি পারবে। আর অজ্ঞতার কথা যা বলছো তা খুবই সত্য। এই খেটে খাওয়া আদিবাসী আর সাধারণ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষগুলো এতো অজ্ঞ কেন জান? ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়নি বলে।

শিক্ষা পেলে ওরা যে বিদ্রোহ করবে। নিজেদের অধিকারের জন্য প্রাণপণ লড়াই করবে। কালো গোখরোর মত ছোবল মারবে।

আসল কথা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নাম করে আমলাতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা করছে। আজও রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি নবাব বাদশাদেরই মতো সুখে ও ভোগবিলাসে দিনাতিপাত করছেন। একজন রাজ্যপাল পুষতে বৎসরে বর্তমান সরকারের যা ব্যয় হয় তা দিয়ে বিশখানা উচ্চবিদ্যালয় চলতে পারে। এ সবের খবর তোমরা রাখো না, কি বুঝবে বলো। এই যে নারীমুক্তির কথা বলছে, নারী স্বাধীনতার কথা বলছে, সভা হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, সবই ভাঁওতাবাজী। এক-একটা রাজনৈতিক স্টান্ট। আজও নারীরা সংসারে গাধার খাটালি খাটে আর সন্তান ধারণ করে। কতকগুলো কু-সংস্কার, কু-প্রথা এখনও আমাদের সমাজে সমানভাবে শেকড় গেড়ে বসে আছে। বর্তমান প্রথায় বিয়ে একটা ইললিগাল বণ্ড। বিয়ে হলেই প্রত্যেক নারীকে তার স্বামীর ঘর করতে হয়। তা-সেই স্বামী যত লম্পটই হোক, কুচরিত্রের হোক। যত নির্যাতনই করুক স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে হয়, তার স্ত্রীকে। একচুল এধার ওধার হলেই চলে শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার। অবশ্য তাই বলে আমি বিয়েটাকে খারাপ বলছি না। বলছি—বিয়ে মানেই তো দাসত্ব নয়। আমি একজন মেয়েকে বিয়ে করেছি বলেই যে সে আমার কেনা বাঁদী হয়ে গেল, এ কেমন নীতি। প্রত্যেক নারীরই অর্থনৈতিক ও সামাজিক একটা স্বাধীনতা আছে। এই অধিকার থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয়। আসলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা আজও অসহায়া। ঠিক এইরকম অসহায়া নারীদের চেয়েও অসহায় সহজ সরল খেটে খাওয়া মানুষগুলো। এদের ঠকিয়েই রাজনৈতিক মাতব্বর দাদারা গদি আঁকড়ে বসে আছেন।

বাড়ীর পিছনে একটা বড় শাল গাছ ছিল। শাল-সেগুনে আচ্ছাদিত, সুরম্য বনভূমি বেষ্টিত ঝাড়গ্রাম শহরের এস. ডি. পি. ও-র কোয়ার্টারে বসে তারই স্ত্রীকে আমি নারী মুক্তির কথা শুনোচ্ছি।

আমার পূর্ব প্রেমিকা সেই বাল্য সঙ্গিনী দিপালীকে। যার বাড়িতে, যার অনুগ্রহে আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি। পেয়েছি একটা দিনের জন্য আশ্রয়। শালগাছটা থেকে একটা পিঁউ-কাহা পাখী ডেকে উঠল। পিউ-কাঁহা-পিউ-কাঁহা-পিউ-কাঁহা। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। দিপালীর মনের অবস্থা যে টালমাটাল তাও বুঝতে পারলাম। সন্ধ্যারাগের মতোই পূর্ব অনুরাগের কথা যে তার মনে পড়ছিল, মনে যে শিথিলতা আসছিল তাও বুঝা গেল। সুন্দরী যুবতী রমণী নাকি সুরম্য বনভূমির মতোই মানুষকে করে তুলে নেশাগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত, পাগল। সময়, কাল, অবস্থার কথা তখন ভুলে যায় পাত্র পাত্রী, ভুলে যায় ভূত ভবিষ্যত।

নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হতে লাগল। মনে পড়ে গেল আমি মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত একজন বিপ্লবী। প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম—অলোকবাবুকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছা করছে তাই না?

আমার কথা শুনে দিপালী খুব গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারলাম কথাটা বলে ওকে কষ্ট দিলাম যতই হোক স্বামী বিপদের সম্মুখীন এবং সে বিপদের হোতা আমি ও আমার পার্টি। খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। বুদ্ধিমতী দিপালীই কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনের এই আড়ষ্ঠতার অবসান করলো। বললো—অভিদা একটু বসো তোমাদের ডিনার রেডি হলো কিনা দেখি।

দিপালী চলে গেল। আমি রজতদার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। রজতদার সাথে যে কোন ভাবে যোগাযোগ প্রয়োজন। আমি ও আমার পার্টি কদিন হল রজতদার কাছ থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এদিকে শিবিরের খাবার ফুরিয়ে আসছে—দেখে এসেছি। অবরোধ ভাঙ্গার জন্যে বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। জানি না কতটুকু সাকসেস ফুল হবে। প্রত্যেকটি স্টেটে আমাদের সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে। শান্তিদা, ভূপেনদা প্রধান দায়িত্বে থাকলেও স্থানীয় কমরেডদেরও কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

সংগঠণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। তবে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে। প্রফেসর লাহিড়ী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। উনি সুস্থ হয়ে উঠলেই আমাকে হয়তো এই স্টেট ছেড়ে অন্য স্টেটে চলে যেতে হবে। এখানকার সংগঠনের প্রধান দায়িত্বে থাকবেন প্রফেসর লাহিড়ী, রজতদা, সুকুমার।

যে সব বামপন্থী দলগুলি আমাদের পার্টির নীতিতে বিশ্বাসী তাদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারাও যেন তাদের সংগঠণকে দৃঢ় করে। প্রতি-বিপ্লবীদের একটি অংশ সরকারের সাথে আপোষ করেছে। তারা আমাদের পার্টির কিছু কিছু গোপন তথ্যও ফাঁস করে দিয়েছে। তাই বহু একনিষ্ঠ কর্মী জেল হাজতে। তবে শত চেষ্টা করেও সরকার আমাদের পার্টির কর্মসূচীর ব্লুপ্রিণ্ট সংগ্রহ করতে পারেনি। পারলে হয়তো আমাদের উপর একটা কড়া আঘাত হানতো। বিপ্লবকে পিছিয়ে দিত।

অভিদা, এসো, ভাত বাড়া হয়ে গেছে—দিপালী খাবার জন্যে ডাকতে এলো।

আমি সঙ্গীটিকে পাশের ঘরে ডাকতে গিয়ে দেখলাম সে ঘুমে অচৈতন্য। তাকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঘুম থেকে জাগাতে হলো। কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা যাচ্ছিল।

ডাল, তেলাপিয়া মাছের তেলঝাল, পুঁইশাকের চচ্চড়ি, বনকুঁদরি ভাজা, আলু ভাতে এই ছিল মেনু। আমি যখন খাচ্ছিলাম দিপালী কাছেই বসেছিল। ওদের বাড়িতে যখন খেতাম ওর মায়ের সেই মমতা মাখানো কথাগুলি মনে পড়ছিল—পেট ভরে খাও বাবা, লজ্জা করো না। খেতে লজ্জা করলে নিজেই কষ্ট পাবে, শরীরকে কষ্ট দেওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি···।

অন্যদিন বা অন্য সময় হলে দিপালীও হয়তো দু'-একটি মেনু বেশী করে খাবার জন্যে জেদাজেদি করতো। আজ বোধ হয় লজ্জার জন্যেই বেশী জেদাজেদি করলো না। শুধু—আর কিছু দেবো, দুটি ভাত দিই

—এই বলেই দেখলাম চুপ করে রইলো। খেতে খেতে চিন্তা করলাম খেয়ে-দেয়ে না ঘুমিয়ে রজতদার কাছে যাওয়া প্রয়োজন। রতজদাকে সব কিছু জানিয়ে অবরোধ কি ভাবে ভাঙা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। অবরোধ না ভাঙতে পারলে ভীষণ এক বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। দলে বিদ্রোহও হতে পারে।

আমাদের পার্টির মুখপত্র 'গণচেতনার' অফিসটি সরকার পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, লাহিড়ীবাবু এ্যারেষ্ট হবার পর। নূতন ভাবে কাগজ বের করার জন্যে আবার চেষ্টা করছেন ভূপেনদা।

পার্টির মুখপত্রে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তা শ্রমিকদের মনে উৎসাহ দেয়। তারা মনে ও শরীরে জোর পায়।

যে কোন পার্টিরই কাগজ আছে। মুখের ভাষার চেয়ে ছাপার অক্ষরের ক্ষমতা বেশী। ছাপার অক্ষর মনের গভীরে প্রবেশ করে। মুখে সব সময় সব কিছু বলা সম্ভব নয়। গণমাধ্যমের ও গণজাগরণের একমাত্র হাতিয়ার—কাগজ। পেম ইজ মাইটার ঞান সোড্। তাই মার্কস সভা-সমিতির মতই পত্রিকার উপরও গুরুত্ব দিতেন সমান ভাবে। তাঁর—'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্গ'—পত্রিকা তৎকালীন বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ঘুম কেড়ে নিয়েছিল লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী শ্রমিকের। যারা শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে লড়াই করছিল।

আমার মনেও চলছিল যুদ্ধ। দিপালী কত বদলে গেছে। বদল হয়েছে দিপালীর মন ও শরীর। বয়সের সাথে শরীরের ও মনের গভীর সম্পর্ক। বয়স বাড়লে অভিজ্ঞতা বাড়ে। অভিজ্ঞতা বাড়লে বদল হয় মানুষের রুচির। পরকীয়া প্রেম প্রথম যৌবনে যতটা প্রবল থাকে, বয়স বাড়লে ততটাই কমে যায়। দিপালীর সেই পুর্বের মতো আবেগ, সেই চোখের চাহনি, আজ কতো পরিবর্তিত। সংসার করলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়। সন্তান হলে তো কথাই নেই। মেয়েদের ছেলেমেয়ে হওয়ার সাথে সাথেই পুরুষের প্রতি টান কমে যায়।

প্রায় আধাআধি। ভালবাসা রূপান্তরিত হয় স্নেহে। স্বামীর চেয়ে সন্তান স্নেহ মেয়েদের প্রবল। এটা অতি নিকৃষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। স্ত্রীর ছেলেমেয়ে হলে পুরুষদের স্ত্রীর প্রতি টান কমে যায়। পরকীয়া প্রেম পরগাছার মতোই মনে এসে আশ্রয় নেয়। অবশ্য সব মেয়ে ও পুরুষের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না।

দিপালীর বয়স খুব বেশী নয়। বড় জোর বাইশ। আমার চেয়ে প্রায় তিন বছরের ছোট। এখন দেখলে বেশ গৃহিনী গৃহিনী মনে হয়। যতক্ষণ দিপালী আমার দু'টো চোখের লেন্সের আওতার মধ্যে ছিল ততক্ষণ আমি ওকে দু'চোখ ভরে দেখেছি। দিপালী নিঃসন্দেহে সুন্দরী। দেখা মাত্র যে কোন পুরুষের কামনার, ভালবাসার উদ্ভব হবে।

পুরুষ ও নারী, নারী ও পুরুষ, প্রকৃতি আর পুরুষ। সেই আদিম যুগে, আদম আর ইভের মতোই এখনও বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগেও পুরুষ হারিয়ে ফেলে সমস্ত সত্বা নারীর কাছে, নারী বিকিয়ে দেয় দেহ, মন, প্রাণ পুরুষের বাহু বেষ্টনীর মধ্যে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বর্তমানের গবেষণায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সকলেই কোন না কোন সময়ে প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে গেছেন প্রকৃতির অমোঘ খেলায়। আমি বিপ্লবী, আমার মনেও যে সাময়িক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তা পুরোপুরি অনুভব করলাম।

সাহিত্য ছিল আমার সবচেয়ে ফেভারিট সাবজেক্ট। খুব কম বয়সেই কালিদাসের মেঘদূত, বঙ্কিম, শরৎ, শেক্সপিয়ার, জীবনানন্দ, মার্কস, লেলিন সবই পড়েছিলাম। আমাদের বাড়িতে এইসব বই-এর কোন অভাব ছিল না। মা ছিলেন গ্রন্থকীট। মা আমাকে সবসময় উৎসাহ দিতেন নামী-নামী লেখকের বই পড়তে। আমারও তখন খুব ইচ্ছে হতো বড়ো হয়ে এই সব লেখকদের মতোই একজন হবো। আজ জীবনের তরী অন্য পথে। জানিনা কোথায় গিয়ে ভিড়বে।

# চতুর্থ পর্ব

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিবে এল। রাত বেড়ে গভীর হলো। এবার বিদায়ের পালা। দিপালীর ছেলেটা ঘুমিয়ে আছে। ওর বিষণ্ণ মুখ আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। আহত স্বামীর জন্যে আমি মেডিসিন আনতে এসেছি এ-যুক্তি তাকে যতটা না সহানুভূতিশীল করে তুলেছে তার চেয়ে অসহায়া করে তুলেছে বাল্য প্রেম। দিপালীর অবস্থা ঠিক ঢোঁড়া সাপের কইমাছ গেলার মতো। না পারছে গিলতে না পারছে উগরে দিতে।

সঙ্গী বিপ্লবীটি সন্ধে বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম নেই আমার আর দিপালীর চোখে। দু'জনের মধ্যে কৈশোরের সেই সব দিনের মতো কত অব্যক্ত কথা চোখে চোখে বলা হ'ল তা কেউ কাউকে ব্যক্ত করতে পারলাম না। শরীরে ক্লান্তি ছিল। মনে ছিল প্রচণ্ড চিন্তা। সত্বর মেডিসিন নিয়ে গিয়ে অলোকবাবুর চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে, ইনফেকসান্ যাতে আয়ত্তের বাইরে চলে না যায়। আমার দায়িত্ব-বোধ সম্বন্ধে দিপালীর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই বোধ হয় সে আমাকে তার আহত স্বামীর কথা বার বার বলে লজ্জা দিতে চায়নি।

প্রকৃতি আর পুরুষের প্রেম যে কী, কী তার গভীরতা, কতদূর তার ব্যাপকতা, কিই বা তার বিশেষণ, এ নিয়ে কত গবেষণা হয়েছে। আধুনিক কালেও কত যে গবেষণা হচ্ছে তার লেখা-জোখা নেই। অসীম শূন্যের মতোই এ বস্তুটির কোন কূল কিনারা নেই। প্রেমের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও যৌন বিজ্ঞানী যে সব সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তাও বেশ বিঁচিত্র। সেই আর্য সভ্যতার কাল থেকে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এ দেশের মহাকাব্যে, নানান সাহিত্যের মধ্যে কত বৈধ ও অবৈধ প্রেমের কাহিনী আজও মানুষের মনে ঝড় তোলে—কাঁদায় হাসায়। কিন্তু কি আশ্চর্য অবৈধ প্রেম যত শক্তিশালী বৈধ প্রেম তার তুলনায় অনেক কম। শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রেম, দৌপদীর

কৃষ্ণ প্রেম প্রভৃতি মহাকাব্যের চরম সুখ-দুঃখের গভীর তাৎপর্য পূর্ণ ব্যঞ্জনা।

দিপালী আর আমার সেই বাল্য কৈশোরের প্রেম বৈধও নয় আবার অবৈধও বলা চলে না। কোথায় যেন কি একটা দাগ রয়ে গেছে। অপূর্ণতা পূর্ণতাকে ঘিরে কলকল নিনাদে ঝংকার তুলে চলেছে এই মুহূর্তে।

সঙ্গীকে নিয়ে যখন দিপালীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন আমি এক অন্য মানুষ। দিপালীর ছল-ছল আঁখি দু'টি আমার মনুষ্য-সত্ত্বাকে কাঁপিয়ে তুলছিল। নিস্তব্ধ বনানী যেন কত কি বলতে চাইছিল—'যেতে নাহি দিব'। তবুও যেতে হবে। যাওয়া আর আসা। আসা আর যাওয়া। চক্রবৎ। অতএব যেতেই হবে।

অবরোধ কড়া থাকায় মাথায় চিন্তা ছিল। সঙ্গীটিকে নিয়ে বনের যে প্রান্ত দিয়ে এসেছিলাম সে প্রান্ত দিয়ে না যাওয়াই স্থির করলাম, অন্য পথ ধরলাম। আর মাত্র দু'-আড়াই ঘণ্টা বাকি—তারপরেই উষা। উষার পূর্বে আমাদের ঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে। তাই নিরাপত্তার কথা ভেবে রজতদার কাছে যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করলাম।

ঝাড়গ্রাম শহরের মাঝ দিয়ে যখন হাঁটছিলাম তখন মনে হ'ল প্রকৃতি এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বড় বড় ইউকলিপটাস, শাল প্রভৃতি গাছ থেকে দু'-একটা পাখি উড়ে গিয়ে অন্য গাছে বসছিল। তাদের ডানা ঝটপটানির শব্দ রাত্রির গভীরতাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল।

আমরা এসেছিলাম জঙ্গলের উত্তর ধার দিয়ে। একটু ঘুরে পশ্চিম ধার দিয়ে যাবার মনস্থ করলাম। তাড়াতাড়ি হাঁটা প্রয়োজন। সঙ্গীকে বললাম—বি কুইক। তাড়াতাড়ি পা চালাও।

পাঁচটা পনের মিনিটের সময় জঙ্গলের কাছে এসে পড়লাম। পকেট ডায়েরি খুলে নক্সাটা দেখে নিলাম। পশ্চিম ধারের পথের। কারণ এখানের জঙ্গল এতো ঘন যে ঠিকমতো পথ ধরে না হাঁটতে পারলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। আর একবার হারিয়ে গেলে দিক ভ্রম হয়ে

পড়ে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছন খুব কষ্টকর হয়। তাছাড়া সাপ-খোপ নানা রকম কীটের ভয়ও ভীষণ। শাঁখামুটি, গোখরো, চিতি প্রভৃতি বিষধর সাপ যেখানে-সেখানে থাকে। অন্ধকারে দেহে পা পড়লে সমূহ বিপদ। আগে এই জঙ্গল এত ঘন ছিল যে বাঘ, সিংহ, হাতি প্রভৃতি থাকত। এখন ঠিকাদারেরা জঙ্গল কেটে অনেকখানি সাফ-সুতরো করে দিয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে দু'-একটা নেকড়ে, ভালুক দেখা যায়। হাতিও আছে এই জঙ্গলে।

ভাগ্য ভাল আমরা যেখানে গিয়ে বনের পথ ধরলাম তখন সেখানে দু'জনমাত্র গার্ড ছিল। বিশ ত্রিশ গজ দূরে দূরে। ভোর রাতে তারা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সঙ্গীকে ইশারায় কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি পিছন পিছন হাঁটতে নির্দেশ দিয়ে পা চালাতে লাগলাম।

এক রকম প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। ডাক্তার আমাকে দেখতে পেয়েই সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে সোল্লাসে জড়িয়ে ধরলেন, উৎগ্রীব অধিকাংশ পার্টি কর্মীরা ছুটে এল। সকলেই যে চরম উত্তেজনায় ছিল চোখ-মুখ দেখেই বোঝা গেল। আমি ব্যাগ থেকে মেডিসিন বের করে ডাক্তারের হাতে দিয়ে বেতার কেন্দ্রের দিকে গেলাম। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এখনই ভূপেনদাকে নিউজ পাঠাতে হবে।

পর পর দু'-দিনের টেনশন ও ক্লান্তির জন্যে সন্ধে বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাঝরাতে ভীষণ একটা গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে শিবিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। সকলেই দেখলাম খুবই আতঙ্কগ্রস্থ। তিন চারটে বিমান ভীষণ গর্জন করে মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে। আমি সবাইকে বন্দুক নিয়ে রেডি হতে বললাম। বিমান আক্রমন হলে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল মিনিট পনের পরেই সব কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সমস্ত বন কাঁপিয়ে তখন পশুপাখি চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। পশু-পাখিদের ভয়ার্ত চিৎকার আর এগাছ-ওগাছ ওড়া-ওড়িতে গোটা বন যেন থর-থর কম্পমান।

পৃথিবীর সকল মুক্তি যোদ্ধাকেই কোন না কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি বর্তমানে যে বিপদের সম্মুখীন তা খুব ভয়াবহ। শিবিরে রসদ প্রায় নেই বললেই চলে। ভুপেনদা রেডিও গ্রামে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যেমন করে হোক, অবরোধ ভাঙতে হবে। কারণ বাহির থেকে কোন রকমেই রসদ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। খড়্গপুর, কলাই কুণ্ডা প্রভৃতি মেন রাস্তাগুলো সরকার সিল করে দিয়েছে। হাঁটা পথেও বিভিন্ন জায়গায় সার্চ হচ্ছে। এমতাবস্থায় কি করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। বনের ফলমূল পশু-পাখীর মাংস এমনিতেই ব্যবহার করে করে প্রায় শেষ অবস্থায় পৌছে গেছে। এখন কি করা যায়? হঠাৎ একটা অদ্ভুত বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল।

ছোটবেলায় আমি, আমার বাল্য বন্ধু নিতাই আর যুধিষ্ঠীর তিনজনে মিলে একদিন ঠিক করলাম খেঁজুর রস চুরি করে খাব। শীতকালে আমাদের গ্রামে অন্য জায়গা থেকে কিছু লোক গাছ বাঁধতে আসত। যাদের খেঁজুর গাছ আছে তাদের পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা করে দিত। বিনিময়ে তারা সমস্ত শীতকালটা গাছ থেকে রস সংগ্রহ করত। সেই রস তারা গুড় ও পাটালি করে আমাদের গ্রামেই বিক্রী করত। মাঝে মাঝে দেখা যেত গ্রামের উঠতি ছেলেছোকরারা ভোর বেলা পাশি-ওয়ালারা রস সংগ্রহ করার আগেই হাঁড়ি নামিয়ে খেয়ে নিত। তাই তারা রসের হাঁড়িতে কলকে বীজ দিয়ে রাখত যাতে রস চুরি করে খেতে না পারে। কিংবা খেলেও ধরা পড়ে যায়।

কল্কে বীজে বিষ থাকে। তা মিষ্টি জাতীয় কোন জিনিষে আরও ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু গোটা বীজ না ভেঙে বা না ফাটিয়ে রসে দিয়ে রাখলে রস খেলে নেশা হয়, কিন্তু কেউ মরে না। এসব ব্যাপার আমরা কেউই তখন জানতাম না। সেই বয়সে জানাও সম্ভব নয়। যারা রস চুরি করত তারা আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিল।

আমাদের বাড়ির পাশেই রতন সূত্রধরের ডোবার পাড়ে একটা খেঁজুর গাছ ছিল। খুব রসও পড়ত। একদিন ভোরবেলা উঠে তিন

জনে মিলে সেই রস চুরি করে খাব ঠিক করলাম। যা ভাবা তাই কাজ। আমি গাছে উঠতে জানতাম। গাছ বেয়ে রস পেড়ে নিয়ে এলাম। হাঁড়িতে দু'টো কল্কে বীজ ছিল। বীজ দুটো বের করে ফেলে দিয়ে তিনজনে মিলে পেট ভরে রস খেয়ে হাঁড়িটা নীচে রেখে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

তিনজনে একই পাঠশালায় পড়তাম। পড়তে গেছি। খানিক বাদেই তিনজনেই ঢুলতে লাগলাম। সাতকড়ি মাষ্টার মশাই তো অবাক! প্রথমে বকা-বকি করলেন, তাতে কারও ঢোলা থামল না। দু'চার ঘা বেত খেয়েও যখন আমাদের চৈতন্য হ'ল না তখন তিনি বাড়িতে লোক পাঠালেন। এদিকে ব্যাপারটা জানাজনি হয়ে গেছে। আমাদের রস খেতে দেখেছিল রতন সূত্রধরের মেয়ে হরিমতি। সে বাড়িতে খবরটা ততক্ষণে পৌঁছে দিয়েছে। সে কি ভয়ানক পরিস্থিতি! বাড়ির লোকেদের ভয়, উৎকণ্ঠা দেখে ভীষণ ভয় খেয়ে গিয়েছিলাম। ঘোলের সরবৎ, তেঁতুল প্রভৃতি খেয়ে সে যাত্রা কোন রকমে বিষ-ক্রিয়া থেকে রক্ষে পাই।

সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। আমাদের শিবিরের পাশে যে ঝরনা ছিল সেই ঝরনার কাছে বেশ কয়েকটা তাল ও খেঁজুর গাছ ছিল। ধারালো ছুরি দিয়ে তাল গাছের নরম পাতা ও খেঁজুর গাছ কেটে রস ধরবার ব্যবস্থা করা হ'ল। তাতে ওয়াইন মিশিয়ে আদিবাসী মুক্তি যোদ্ধাদের সাধারণ বেশে পাঠিয়ে দিলাম সি. আর. পিদের. কৌশলে রস খাওয়াবার জন্যে। ভাল ফল মিলল। রস বারো ঘণ্টা রয়ে গেলে তাড়িতে পরিণত হয়। তাড়ি খেলে কিছুটা নেশা হয়। ওয়াইন দেওয়ার ফলে, দিনের পর দিন সি. আর. পিদের নেশা বাড়তে লাগল। চার পাঁচ দিন বাদে এ্যাকসনের জন্যে সকলকে প্রস্তুত হতে বললাম।

শিবিরের সমস্ত খাদ্য ফুরিয়ে গেছে। শান্তিদা—ভুপেনদার বার বার রেডিওগ্রাম পাচ্ছি কৌশলে অবরোধ ভাঙার জন্যে। আমি অভয় দিয়ে যাচ্ছি চেষ্টা করছি বলে।

সকাল থেকে প্রস্তুতি নিয়ে সন্ধের দিকে এ্যাকসনের জন্যে তৈরী হলাম। ওয়াইন মিশ্রিত রস খেয়ে সি. আর. পিরা অচৈতন্য হয়ে পড়লে পনের-কুড়িজন মুক্তি যোদ্ধাকে নিয়ে গভীর রাতে প্লান মতো ঝাড়গ্রামের সরকারী শস্যের গুদাম লুট করা হ'ল। ঐ দিনই কিছু মুক্তি ফৌজকে হাঁটাপথে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল জঙ্গলের বাইরে। ভুপেনদার নির্দেশ মত।

অলোকবাবু মোটামুটি সুস্থ হোয়ে উঠেছেন। তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। আমাদের আত্মত্যাগ দেখে অলোকবাবুর অনেকখানি মানসিক পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি কম কথা বলেন। সব সময় দেখা যায় পার্টির বই পড়ছেন।

যেদিন ঝাড়গ্রামের শস্যের গুদাম লুট করা হয় সেদিনই প্রচারপত্র দ্বারা প্রচার করা হয় সমস্ত বিপ্লবী জঙ্গল থেকে অন্যত্র চলে গেছে। এর ফলে দেখা গেল কয়েকদিন বাদেই সরকার অবরোধ তুলে নিল।

কয়েকটি শর্ত আরোপ ক'রে—বণ্ডে সই করিয়ে নিয়ে অলোকবাবুকে গার্ড দিয়ে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এখানকার কিছু গেরিলা ক্যাডারকে মিশিয়ে দেওয়া হ'ল শহর ও গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে।

অলোকবাবু যাবার দিন আমাদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত ব্যবহার করে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমি চরম ও পরম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম।

দেশের জনগণ যদি বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ না হন তাহলে কোন দেশেই বিপ্লব সার্থকতা লাভ করে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রধানরা সহজেই বিপ্লবকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে। রাষ্ট্র প্রধানরা প্রচার মাধ্যমের দ্বারা প্রথমে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে। পরে বিপ্লবীদের বন্দীকরে এবং হত্যা ক'রে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখে। আর যারা বিপ্লবী তাদেরকেও ভালভাবে জানতে হয় তারা বিপ্লব করছে কেন। শুধু কি অর্থ নৈতিক অসাম্যতার প্রতিবিধানে? না—তা নয়। শুধু অর্থ নৈতিক অসাম্যতার

প্রতি বিধানে যদি কোন বিপ্লব হয় তাহলে কখনই সেই বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যা ঘটে ছিল ফ্রান্সে। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী যারাই বিপ্লব করুক না কেন সকলকেই ভাবতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা। ক্ষমতা দখল করে উপযুক্ত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র ভার দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করাই হবে বিপ্লবীদের লক্ষ্য। এ নিয়ে আমাদের সাথে অলোকবাবুর অনেক তর্কবিতর্ক হয়। বুদ্ধিমান আই. পি. এস অফিসার অলোকবাবুর চিন্তাধারা খুবই জনমুখী। তর্কে বুঝতে পেরেছিলাম।

তবে ক্ষমতা এক অদ্ভুত জিনিষ। নেশার মতো ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। দেখা গেছে বিনা রক্তপাতে যেখানেই ক্ষমতা দখল হয়েছে সেখানেই বিপ্লব গেছে থেমে। কারণ দেশের কিছু বুদ্ধিমান ক্ষমতালিপ্সু লোক যারা সামরিক প্রধান অথবা নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে তারা বিপ্লবের নামাবলি গায়ে দিয়ে জনগণের সাহায্য নিয়ে গদি দখল করে। পরে ক্ষমতার নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে—হ'য়ে পড়ে স্বৈরতন্ত্রের পূজারী। কিন্তু যদি দেশের সাধারণ নাগরিক স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে লড়াই ক'রে, বিপ্লবে অংশ নিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটায় তাহলে সে দেশের শাসনকর্তারা সহজে স্বৈরতন্ত্রী হ'য়ে উঠতে পারে না।

কোন দেশের রাষ্ট্রনেতার মুক্তি যুদ্ধের তত্ত্ব ও তথ্যকে অন্য দেশে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা কখনও উচিত নয়। নিজের দেশের স্থান কাল পাত্র ভেবে তত্ত্ব ও তথ্যকে সংশোধন করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। মুক্তি যোদ্ধা তৈরী করতে হয় একেবারে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী থেকে। আর শহরের মুক্তি যোদ্ধাদের সাথে গ্রামের মুক্তি যোদ্ধাদের সব সময় যোগ-সূত্র রক্ষা করে চলা উচিত।

তাই আমি শহরের মতো গ্রামের সংগঠনের উপরও সমান গুরুত্ব দেবার পলিসি গ্রহণ করেছিলাম। জনা-বিশেক মুক্তিযোদ্ধাকে জঙ্গলের শিবিরে রেখে, রাজাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে, অন্যান্য মুক্তি যোদ্ধাদের এখানে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে, আমার বডি গার্ডকে নিয়ে

রজতদার সাথে দেখা করতে গেলাম। দরজা ঠেলতেই কালো বেঁটে করে একজন ছোকরা বেরিয়ে এসে বলল—বাবু, উনাকে তো আজ প্রায় মাসখানেক হ'ল পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কি সব পার্টি-টাটি করত সেই জন্যে। খবরটা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম না। কারণ আমি জানতাম রজতদা এ্যারেষ্ট হতে পারে। বেশ কিছু দিন আগেই সরকার রজতদার পিছনে সি. আই. ডি লাগিয়েছিল।

মনে হয় আমাদের অবস্থার কথা চিন্তা করে, ভূপেনদা আমাকে এ খবরটা দেননি। বেশ কিছুদিন আমাদের অবরোধের মধ্যে স্বল্প খাদ্যে কাটাতে হয়েছিল। খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে পাছে শিবিরের ফৌজদের মনোবল ভেঙে পড়ে এই কথা চিন্তা করে বোধ হয় খবরটা গোপন রেখেছিলেন।

শান্তিদা বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। দেশের প্রায় প্রতিটি স্টেটেই সংগঠন মজবুত হয়েছে। যে কোন সময় গোপন মুক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিতে পারেন। বিরাট রাজশক্তির বিরুদ্ধে গেরিলাদের যুদ্ধ। একদিকে লক্ষ লক্ষ ভাড়াটিয়া ফৌজ অন্যদিকে মুক্তিকামী দেশসেবী গেরিলা। দলেদলে বিভক্ত হয়ে জনগণের সাথে মিশে গেছে গেরিলারা। এবারে আঘাত হানার পালা।

আমরা ছদ্মবেশে বেরিয়েছি। আমি একজন বিড়ির পাতার ব্যবসায়ী আর বডি গার্ড দু'জন আমার ব্যবসার সাহায্যকারী। রজতদার বাসা থেকে ফিরে ওয়ারলেশ করে ভূপেনদাকে সমস্ত কিছু জানিয়ে মেসেজ দিলাম। ভূপেনদা আমাদের সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। রাত্রি ন'টার সময় একটা ট্রাক এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে কলকাতায়। শশাঙ্কদা আসবেন আমাদের নিয়ে যেতে।

সারাদিন ঝাড়গ্রাম শহরের এখানে-ওখানে ঘুরে কাটালাম। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে লোধাদের একটা গ্রাম দেখে এলাম। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও এই জাতিটা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার সুযোগ-টুকু থেকেও বঞ্চিত। হায় আমাদের স্বাধীনতা! বঞ্চনার বেড়াজালে লক্ষ

লক্ষ কোটি কোটি মানুষ। মুক্তি যুদ্ধ ভিন্ন কে দেবে মুক্তি পথের সন্ধান? দেশের সম্পদ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই যে পুঁজিপতিদের সেফটি লকারে বন্দী। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে সব কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র নিজেদের দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে—তারাই সাহায্য করছে আমাদের শোষক রাষ্ট্র নেতাদের অর্থ দিয়ে। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে। এরা যে কি ধরণের কমিউনিষ্ট বুঝিনা!

নির্ধারিত সময়ে শশাঙ্কদা নামলেন। একমুখ দাড়িতে নেট—মাথায় পাগড়ি—পরনে লুঙি। শশাঙ্কদাকে বেশ মানিয়ে ছিল। প্যান্ট-শার্ট পরে হাতে ফোল্ডিং ডায়েরি নিয়ে শশাঙ্কদা যখন কলেজে যেতেন তখন দেখলে কেউ ভাবতেই পারত না যে তিনি একজন এতবড় বিপ্লবী হতে পারেন।

সঙ্গী মুক্তি যোদ্ধা দু'জনকে নিয়ে টাকে উঠলাম। ট্রাক ছেড়ে দিল। ফুল স্পীডে চলতে লাগল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা প্রায় কলাই কুণ্ডার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। শশাঙ্কদা গতি একটু মন্থর করে বললেন—তোকে এবার ড্রাইভিংটা শিখিয়ে দিতে হবে। কারণ বিদেশ বিভুঁই-এ যাবি ড্রাইভিংটা শিখে রাখা ভাল। আমি কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—বিদেশ বিভুঁই মানে? শশাঙ্কদা বললেন—পলিটবুরোর মিটিং-এ ঠিক হয়েছে তোকে আর বিভাকে দিল্লিতে যেয়ে কাজ করতে হবে। আমি কিছু মাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—বিভা কি যেতে রাজি হবে? শশাঙ্কদা আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—রাজি হবেনা মানে? পার্টির নির্দেশ। ভূপেনদারও তাই মত। বাহির থেকে সব অস্ত্রসস্ত্র এসে গেছে। রকেট, গ্রেনেড, কামান, প্রভৃতি সব কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র এখন আমাদের হাতে। আমরা ঠিক করেছি এক সাথে আমরা সমস্ত স্টেট আর রাজধানীতে আঘাত হানব। দেখে নিস্ এবার সরকার আর আমাদের কোন রকমেও ছিন্ন-ভিন্ন করতে পারবে না। আমরা যা চেয়ে ছিলাম—মফঃস্বল আর শহরের

জনগণের সমর্থন, তা আমরা পেয়েছি। সমীক্ষা করে দেখা হয়েছে অন্ততঃ সেভেনটি পারসেণ্ট জনগণ আমাদের নীতিকে সমর্থন করে। বিপ্লব চাই। তাছাড়া আমাদের দেশের চার পাঁচটি বিরোধী দল আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে। এবার জয় আমাদের সু-নিশ্চিত।

আমাদের মধ্যে যখন এ-রকম কথাবার্তা হচ্ছিল হঠাৎ একটা গাড়ির হেড লাইট আমাদের গাড়ির উপর এসে পড়ল। শশাঙ্কদা বাঁ হাত দিয়ে লাইটটা আড়াল করে ট্রাকটা ডান দিকে কাটাবার জন্যে প্রাণপন চেষ্টা করলেন। দেখা গেল—দ্রুতগতিতে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে দু'তিনটে জীপ এসে পথ আটকে দিয়েছে। শশাঙ্কদা ব্রেক কষেই বললেন—পুলিস! বি রেডি—এ্যাকসান। তাড়াতাড়ি বাঁ-ধারের দরজা খুলে আমি আর সঙ্গী দু'জন নেমে ফায়ার করতে যাচ্ছি হঠাৎ তিন চারটে রাইফেল গর্জে উঠল। পিছন দিকে দৌড়বার চেষ্টা করলাম। দেখলাম সেখানেও পুলিশ। শশাঙ্কদা নেমে ফায়ার করেছিলেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। চারধারে পুলিশ আমাদের ঘিরে ফেলেছে। ঘন ঘন আত্মসমর্পণের জন্যে ঘোষণা করছে মাইকে। শশাঙ্কদা সামনে এসে দু'হাত তুলে দাঁড়ালেন। একটা গুলি এসে আমার পায়ে গোড়ালির কাছে লাগে। রক্ত পড়তে থাকে। একজন সঙ্গী গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আমি তবুও আবার ফায়ার করতে যাচ্ছিলাম। শশাঙ্কদা বললেন—স্টপ। আমি রিভলভার টেপা বন্ধ করলাম। শশাঙ্কদা দু'হাত উপর দিকে তুললেন। আমি রাগে গর্জাতে গর্জাতে তার নির্দেশ মতো হাত তুললাম। বেশ কয়েকজন পুলিশ এসে আমাদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। স্বল্প আলোয় সাদা পোশাক পরিহিতি অফিসারের মুখ দেখে রাগে ঘৃণায় আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। ক্রুর হাসি হেসে বললাম—সাবাস্ অলোকবাবু! আপনার মতো রাজভক্ত কর্মচারীকে অশেষ ধন্যবাদ!

প্রায় একমাস হয়ে গেল জেল হাজতে আছি। আমার বিরুদ্ধে পুলিশ খুন, রাহাজানি, দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করেছে। দোষ প্রমাণ

করতে পারলে ফাঁসি হবে। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল লকআপে আমাকে রাখা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে কলকাতাতে ট্রান্সফারও করতে পারে।

আমার পক্ষে পার্টি থেকে দু'জন উকিল দেওয়া হয়েছে। ভূপেনদা এসেছিলেন দেখা করতে। সঙ্গে বিভাও ছিল। কিছুদিন আগে বিভা ছাড়া পেয়েছে। ভূপেনদা বলে গেলেন—ভয়ের বা চিন্তার কোন কারণ নেই। উকিল দু'জন খুবই নামী। প্রয়োজনে হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত কেশ লড়া হবে।

মা এসেছিলেন দেখা করতে। মায়ের চেহারা দেখে আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল। ষাট বছরের বৃদ্ধার মতো দেখাচ্ছিল মাকে। অথচ মায়ের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের উপর নয়। নানা রকম শান্তনা দিয়ে গেলেন। তার বুকের ভিতরে যে বিরাট আগুন জ্বলছিল সে কথা তিনি একবারও প্রকাশ করলেন না। এমনকি এক ফোঁটা চোখের জলও দেখতে পেলাম না চোখে।

দিন যায়—রাত আসে। রাত গড়িয়ে আবার সকাল হয়। লকআপে বসে বসে নানা রকম চিন্তা করি। মনে পড়ে ছোটবেলার দিনগুলো। যখন জীবন সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল না।

শিলাবতীর আঁকা-বাঁকা ধারার মতো বয়ে চলেছে জীবন। কখনও উত্তাল আবার কখনও শান্ত—ধীর—স্থির। এই ক'বছরে কত জায়গায় না ঘুরলাম। দেশকে ভালবেসে কত কি না করলাম। শিলাবতীর প্লাবনে দেশের মাটি হ'য়ে ওঠে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা। আমি চেয়েছিলাম আমার মাতৃভূমিকে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা করতে। বীর প্রসবিনী মাকে শোষণ হীন করতে।

শীর্ণ শিলাবতীর তীরে তীরে কত জানা, নাম না জানা গ্রাম। খাতড়া চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, গড়বেতা, কোলাঘাট প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী নগর। বর্ষায় শিলাবতী দু'কুল ছাপিয়ে আছড়ে পড়ে এই সব গ্রামে, নগরের বুকে। এক হিংস্র বিভীষিকা উত্তাল তরঙ্গের সাথে সাথে নাচতে থাকে। আবার শীতের সকালে সবুজ শস্যে দোল খেয়ে যায় হিম শীতল বাতাস। বুলবুল

শালিক, টিয়া, নানা রঙ ছড়িয়ে মিষ্টি গান গেয়ে নাচে ডালে ডালে, শাখায় শাখায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন কৃষক নবান্নের সুর তুলে গায় জীবন গাথা। বাউল, ভাটিয়ালির সুরে পরান মাঝি নৌকো ভাষায় এই শিলাবতীর বুকে। শোষণের তীব্র যন্ত্রণা ভুলে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ভূমিজ, লোধারা মহুয়ার নেশায় মত্ত হয়ে মশালের তালে তালে নাচতে থাকে উৎসবে। হে আমার বঙ্গ মাতা—তোমাকে শত কোটি প্রণাম! বার বার যেন ফিরে আসি তোমার কোলে। তোমার পলিমাটির সোঁদাগন্ধে যেন ভরে যায় আমার জীবন-যৌবন-প্রাণ-মন। আবার যেন শিলাবতী—তোমার স্রোতধারায় কাগজের নৌকো ভাসিয়ে গেয়ে উঠতে পারি—যারে নৌকো ভেসে যা উজান বেয়ে / সঙ্গে করে আনিস কিন্তু রাজার মেয়ে।

আমি জানি আত্মা অবিনশ্বর। আমরা বিপ্লবী। মাতৃভূমির সেবায়, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সিধু-কানু, প্রীতিলতা যদি আত্মোৎসর্গ করতে পারেন তবে আমিই বা পারব না কেন? আমার যদি ফাঁসি হয় তাতেও আমার কোন ক্ষোভ নেই—দুঃখ নই।

আমাকে রাখা হয়েছে মেদিনীপুর জেলের সেফটি লকআপে। মাঝে মাঝে কেসের দিন পড়লে পুলিশ ভ্যানে চড়িয়ে কোর্টে হাজির করে। শুনানির পর আবার এনে লকআপে ঢুকিয়ে দেয়। শশাঙ্কদাকে পুলিশ তমলুকে নিয়ে গেছে। তমলুক কোর্টে তার বিচার চলছে।

প্রত্যেকদিন পেপার আসে। পেপার দেখি। চতুর্দিকে এ্যাকসন হচ্ছে খবর পাই। আমাদের সংগ্রাম যে এগিয়ে চলেছে তা জানতে পেরে ভীষণ আনন্দ হয়।

তিন মাস পরে রায় বের হ'ল। রায়ে জানা গেল আমরা হেরে গেছি। জজ সাহেব ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। আমাদের পক্ষের উকিল দু'জন বহু চেষ্টা করেছিলেন ফাঁসি রদ করবার। কোন ফল হয়নি। রায় শুনে মা এসেছিলেন। খুব কান্নাকাটি করে গেলেন। এই প্রথম আমি মাকে আমার জন্যে অঝোরে কাঁদতে দেখলাম। আমি

নানা রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে দেশাত্মবোধের কথা বলে মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। মা যাবার সময় বলে গেলেন—কে একজন নামকরা অ্যাডভোকেট, কলকাতায় থাকেন—আমার হ'য়ে কলকাতার হাইকোর্টে আপিল করেছেন—লোয়ার কোর্টে হেরে যাবার পর। মা তাঁর নাম ঠিকানা কিছুই জানেন না।

হাই কোর্টে কেস উঠতে আমাকে কলকাতায় ট্রান্সফার করা হ'ল। নির্ধারিত দিনে কড়া পুলিশ পাহারায় কোর্টে হাজির হ'লাম। আদালত লোকে লোকারণ্য। আমার পক্ষের অ্যাডভোকেটকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এ কি করে সম্ভব? আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। আমি ভুল দেখছি না তো? না। ঐ তো সামনের সিটে বসে আছে, মা, দিপালী, বিভা, দিপালীর কোলে ফুটফুটে সেই বাচ্চাটি।

যে আমাকে এ্যারেষ্ট করাল, সেই এস. ডি. পি. ও অলোকবাবু আমার পক্ষ নিয়ে মামলা লড়ছেন? এও কি সম্ভব?

শুনানির পর আমাকে পুলিশ ভ্যানে তোলার আগে সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এল।

আমার চোখ বাষ্পপূর্ণ হয়ে আসছিল। আবেগে বললাম—অলোক-বাবু, আপনি কি চাকরি ছেড়ে দিলেন?

অলোকবাবু হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন—হ্যাঁ, ইংঙ্গ-মান। পুলিশে ঢোকার আগে ল-টা পড়েছিলাম, সেটা কাজে লেগে গেল। ওরা আপনাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাই এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হই। নাও, ডোণ্ট ওরি—ইংঙ্গ-মান। বি থিঙ্ক—ইউ আর এ রেভোলিউসনিস্ট। পুলিশ ওয়ারনিং দিল। সময় হয়ে গেছে। দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসতে চাইছিল। অলোকবাবুকে নমস্কার জানিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে বসলাম।

---